ব্যক্তিগত বসন্তদিন

মাহবুব মোর্শেদ

সূচিপত্র

বনসাই শিল্প	০১
বড় রাস্তার উপরে একটা ট্রাক	০৭
সোমেন পালিত ও তার প্রতিপুরুষ	১৫
জিসম	২৩
নদীর জল মচকা ফুলের মতো লাল	৩২
উপেন সরকার ও তার তিন কন্যা	৩৮
একটি গল্প– অন্য এক গল্পকারের গল্পের প্রতিলিপি	৪২
সর্পরাজের গল্প	৪৯
সহজ শিশুশিক্ষা ও আমাদের অধিকৈশোর	৫৮
ওভারকোট	৬৭
দ্বিচক্রযান	৭৩

বনসাই শিল্প

শহরে, শহীদ বাবুরাম সড়কের ৩৩ নম্বর বাড়িতে বনসাই ব্যাপারটি প্রথম আমাদের মনোযোগ এড়িয়ে যায়। সেদিন ছিল রবিবার, সময়টা বছরের গ্রীষ্মকাল। 'অরিয়েন্টাল টকিজে'র অচল ভবনের পাশে মরা সাপের মতো পড়ে থাকা বাবুরাম সড়কের দেহে পা রেখে চতুর্থবারের মতো ওই রবিবার আমরা চমকে উঠেছিলাম। সন্ধ্যা-উত্তর গাঢ় আঁধারিতে অতি সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে, তেত্রিশ সংখ্যাটি ৩ দিয়ে ১১ বার বিভাজ্য, এককথাই ভাবছিলাম। বাসবী দত্তও দরজা খুলে চমকে উঠেছিল। এভাবে চমকে দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তবু সে চমকালে আমরা খুশি হয়ে উঠেছিলাম। সে হয়তো ভেবেছিল নিচতলাকে একতলা ভেবে আমরা তার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ভুল কিন্তু করিনি, একতলার অমিত্রাদির সাথে সেদিন কোনো কথা ছিল না। বাসবী দত্তের সাথে ছিল। বসবার ঘরে বসতে দিয়ে বাসবী 'তোদের জন্য চা করতে যাই। দাদাকে পাঠাচ্ছি, গল্প কর।' বলেছিল। ওরা সম্ভবত এতক্ষণ ঠাকুরঘরে ছিল। দাদার পোশাক থেকে ধুপধুনোর ঘ্রাণ আসছিল, হয়তো এ কারণেই। কিন্তু তার সাথে কিছুতেই আলাপ জমে উঠছিল না। ঝুরঝুরে হয়ে পড়া চুনের সিলিং এর দিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিলো আমাদের। এতে আরো অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। কিছু করার ছিল না। তাই দ্বিধা ভরে একবার ফ্যান বাড়াতে, একবার টেবিলের এটা ওটা সাজাতে যাচ্ছিলেন। একবার...। শেষে ঘরের কোনার দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যেখান থেকে মানিপ-ন্যান্টের লতাগুলো উঠে জানালা ভরে তুলেছিল। তৎক্ষণাৎ বিষয়ের প্রতি আমাদের মনযোগ ফিরে এসেছিল। স্বল্পায়তন ঘর জুড়ে থাকা গাছগুলো সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম সকলে। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বৈজ্ঞানিক নাম কী মানিপ-ন্যান্টের। এতেই আলাপ জমে উঠেছিল। আগ বাড়িয়ে তিনি মানিপ-ন্যান্ট নিয়ে অনেক কথা বলছিলেন। গাছটির দু'দিনে একটি পাতা বেরোয়, লতা বাড়তে বাড়তে কখনো অনেক বেশি হয়ে গেলে মূলগাছ বাঁচিয়ে সাবধানে ধারালো বে-ড চালাতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসময় চোখের নিচে কালসিটে দাগ, ঘামসিক্ত কপাল আর চা নিয়ে বাসবী এসে দাঁড়িয়েছিল। যেন প্রথম থেকে লতানো গাছপালার আসরে আছে সে এমন ভঙ্গিতে দাদার আলাপে মন দিয়েছিল, চা বাড়িয়ে দেবার পর। ওদের দারুচিনির গাছ ছিল একটা। চা থেকে দারুচিনির কাঁচাপাতার সৌরভ উঠছিল। অথচ চায়ের জন্য তাকে ধন্যবাদ দিলাম না, এতই মগ্ন ছিলাম। এমনকি ঘরের ফার্ন, ক্যাকটাস বনসাইগুলো নিয়েও কথা ওঠেনি। বনসাইগুলো দেখিনি এমন নয়। কিন্তু তাতে ভালমতো নজরে দেয়া যায়নি। কিন্তু ঐ

ভাসাভাসা দেখাটাই মনে ছিল। পরে কেউ জিজ্ঞেস করলে মানিপ-ন্যান্টের বৈজ্ঞানিক নাম ভুলে যেতাম আমরা। এবং বিস্ময়করভাবে বনসাইয়ের ডিটেইলস মনে পড়তো। ঐ দিনটির কথাও ভুলিনি। বাসবী দত্তর সাথে সেদিনই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

তখনো, এবং এর পরবর্তী দুইমাসে আমরা বনসাই নামটি জানতে পারিনি। অনাগ্রহ নয়, ব্যস্ততা ছিল। অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের জন্য মূলশহর ছেড়ে ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতের পাশে উপশহরে চলে গিয়েছিলাম এসময়। তখন লোকজন ভাবতো, আমরা বোধহয় দূরের কোনো শহরে চলে গেছি। প্রকৃতপক্ষেই, তেমন ঘটতে পারতো। কারণ শহরে চাকুরির কোনো সুরাহা হচ্ছিল না।

এ সময়, ৩৩ বাবুরাম সড়কে আমাদের প্রথম ও শেষ চিঠিটি পাঠিয়েছিলাম। শোনা যেত, একই শহরে লেখা এ ধরনের চিঠিগুলো নাকি রাজশাহী, ঢাকা ঘুরে শহরের প্রধান ডাকঘরে পৌঁছায়। দিনক্ষণের এই বোধ মনে রেখে আমরা ভাবছিলাম, অমিত্রাদির কথা, বাবুরাম সড়কে আমাদের ধারাবাহিক আড্ডার কথা এবং বনসাইয়ের নাম, পরিচয় এবং বনসাই করণের নিয়মাবলী জানতে চাওয়া আমাদের চিঠিখানা মঙ্গলবার দিন সকাল দশটা ত্রিশ মিনিটে দাদার হাত হয়ে বাসবী দত্তের হাতে পৌঁছে গেছে। এরপর ৭৬টি সকাল সাড়ে দশটা কেটে গেছে। তবু আমরা জানতে পারিনি বাসবী দত্ত চিঠিটি পেয়েছিল কি-না। কারণ, কোনো উত্তর আমাদের হাতে আসেনি।

ধীরে ধীরে বনসাই সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো আমরা ভুলতে বসেছিলাম। 'দৈনিক কল্যাণে'র অফিসে সংবাদের পিছনে ছুটবার যে কাজ পেয়েছিলাম তাতে গাছ-গাছালি থেকে দূরে থাকাটাই শ্রেয় ছিল। লেটারপ্রেসের কালিঝুলি, তালামারা টেলিফোন সেট এবং সরকারি বরাদ্দের নিউজপ্রিন্টের মাঝে বসে আমরা চারপৃষ্ঠার ডবল ডিমাই ভরাবার সংবাদ খুঁজতাম। এই সময় ফিলিপস ১৪´´ সাদা কালো টেলিভিশনে কোনো উপলক্ষ ছাড়াই বৃক্ষ সম্পর্কিত একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। অনুষ্ঠানে একজন বটানিস্ট বোঝাচ্ছিলেন সূর্যের আলোর প্রতি বৃক্ষের সাড়া দেবার পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে কী করে বৃক্ষের শাখাকে শৈল্পিক ভঙ্গিমায় বাঁকানো যায় অথবা শাখার স্থিতিস্থাপকতাকে কাজে লাগিয়ে ধাতব তার জড়িয়ে কী করে বৃক্ষশাখাকে ঢেউ খেলানো, আঁকা-বাঁকা, গোলাকার ইত্যাদি শেপ দেয়া যায়। অনুষ্ঠানটি আবার বৃক্ষের প্রতি, বিশেষত বনসাইয়ের প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই সময় একদিন আমরা শুনেছিলাম একটি সাময়িক পত্রিকা নাকি বনসাই নিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। তখনো আমরা জানতাম না বনসাই কী। প্রতিদিন শেষরাতে পত্রিকা অফিস থেকে আমরা সাময়িক পত্রিকাগুলো হিপ পকেটে করে ফিরতাম সেগুলো থেকে কোনো ফিচার তৈরি করা যায় কিনা এই আশায়। সেভাবে বনসাই সংক্রান্ত পত্রিকাটিও এসেছিল। আমরা জানতে পেরেছিলাম, বনসাই আসলে কী? এবং ছাপানো ছবি দেখে দেখে জানালা বেয়ে লতিয়ে ওঠা মানিপ-ন্যান্টের কথা মনে পড়েছিল তৎক্ষণাৎ। ওই পত্রিকাতেই লেখা হয়েছিল বনসাই হলো শিল্প। এতে আমাদের পুরাতন কামভাব জেগে উঠেছিল। আমরা দৈনিকের কাজ করতে করতে

ভাবতাম শিল্পের খুব কাছাকাছি মহলে আমাদের কাজ কারবার। তাই একটি প্রশ্নই মনে জেগেছিল 'কী করে?' এবং এরপরেই ভীতি এবং অনিশ্চয়তা আমাদের জীবন ও চিন্তাকে অধিকার করে ফেলেছিল।

একদিন, মজনুশাহকে– 'ভাবেন বনসাই নাকি শিল্প।' বলেছিলাম আমরা। মজনু আমাদের চাচাত ভাই, মামা অথবা বন্ধু। 'একটা গল্প বলি...' বলে একটা সত্য কাহিনী শুনিয়েছিলেন মজনু শাহ। খুব ধীরে গোপন খবরের সূত্র বলে দেবার মতো করে বলেছিলেন, ডাবল ডেকারে বসে। অথবা কোনো থাই রেস্টুরেন্টে। একটা মানুষ ঢাকা গিয়েছিল ব্যবসা করতে। মটরের পার্টসের ব্যবসা শুরু করে চালিয়েও ছিল তিনমাস। তো, তাকে হঠাৎ একদিন থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না আর। মাস গেল, বছর গেল। আত্মীয়-স্বজনরা তার আশা ছেড়েই দিয়েছে। এই সময় তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। ফার্মগেটে, ওভারব্রিজের বামপাশে। আল-া নবীর নাম। ... হাত পা নেই। চোখের কোটর খালি। স্মৃতি আছে কি নেই। ভিক্ষা করছে। মজনু শাহর মনে হয়েছিল লোকটি বনসাই। এখন অবশ্য আমাদের কেউ কেউ বলেন, মজনু শাহর সাথে আদৌ কোনো আলাপ ছিল না আমাদের, যেহেতু শহরে কোনো ডবল ডেকার চলে না, থাই রেস্টুরেন্টও নেই।

কাহিনীটি সত্য-মিথ্যা যাই হোক, সে সময় আমাদের সাথে রাস্তা-ঘাটে অনেক খোড়া, নুলো ল্যাংড়াদের দেখা হতে থাকছিল। অথবা এমনও হতে পারে এদের প্রতিমুহূর্তে দেখে দেখে মজনু শাহর ঘটনাটি আমরা বানিয়ে নিয়েছিলাম। বানানো কথা হলেও এদের দেখে বনসাইয়ের পংঙ্গু, ল্যাংড়া, ঠেস দেয়া, তার জড়ানো গাছগুলোর ছবি মনে আসতো। আমরা ভাবতাম এর শিল্পমূল্য নির্ধারণ করা দরকার। কিন্তু শিল্পমূল্য নির্ধারণে ব্যর্থ হয়ে আমরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখন ডাক্তাররা আমাদেরকে বনসাইয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে বলেছিল। খুঁজে খুঁজে সেনানি-নবাসের কাছে নবীপাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম আমরা। সেনানিবাসের লোকেরা আর যাই করুক ফকির, ল্যাংড়া, নুলোদের কাছ থেকে দূরে থাকে, এই ভেবে। আমাদের ঘর হতে সৈন্যদের মার্চপাস্ট দেখা যেত। প্রতি সকালবেলা স্টপ, এ্যাবাউট টার্ন, হল্ট, এবং বুটের সম্মিলিত শব্দের সাহায্যে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। সৈন্যরা আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে বাজারে কিংবা এক টিকেটে দু'টি ইংরেজি সিনেমা চলতে থাকা প্রেক্ষাগৃহে যেত। জলপাই কালারটি আমাদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। পাখি চেনার মতো কষ্ট স্বীকার করে আমরা একই বর্ণের পোশাক পরা সৈনিকদের ভিন্ন ভিন্নভাবে মনে রাখতে চেষ্ট করছিলাম। সেনানিবাসের লোকজনও নানা সূত্রে জানতো আমরা 'দৈনিক কল্যাণে'র স্টাফ রিপোর্টার। একদিন ঘরের সামনে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের জলপাই কালার টয়োটা থামলে আমরা দেখি মেজর খালেকুজ্জামান নেমে আসছেন। 'আমরা চাই আপনাদের সুকুমার প্রবণতাগুলোর বিকাশ ঘটুক।' শক্ত হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন মেজর। তার কথামতো আমরা বিশাল বাউন্ডারির ভেতর শিশুদের লালন পালনের বিদ্যালয়ে সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে গিয়েছিলাম।

এখানে, শিশুদের মধ্যে সামরিক শৃংখলা প্রবল। কঞ্চি কাঁচা অবস্থাতেই বাঁকাতে হয় একথা মনে রেখে, ছোটবেলাতেই শিশুদের এখানে নিয়ে আসা হয়। তারপর মনের মাধুরি মিশিয়ে ছয়বছর ধরে গড়ে তোলা হয় পরিমিত আলোবাতাস ও নির্ধারিত তাপমাত্রায়। তাদের কথোপকথনের জন্য নির্বাচিত একহাজার শব্দ শেখানো হয়। এই শব্দের আওতার বাইরে তারা ভাব প্রকাশ করে না। এদের অন্তরের প্রধান, যৌথ সচেতনতা হলো– 'দেশপ্রেম'। যৌনতা সংক্রামক একমাত্র শব্দ হলো 'মার্চ এহেড'। শিশুরা আমাদের সামনে একই পোশাক সজ্জিত হয়ে মার্চ করলে আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। 'অদ্ভুত!' বলেছিলাম আমরা। আমাদের পাশে দাঁড়ানো স্কুলের অধ্যক্ষ স্নেহে হেসেছিলেন। 'তবু দেশের ভাগ্য যে প্রতিবছর শিশুদের সবচেয়ে মেধাবি অংশটিকে এখানে পাচ্ছি আমরা।' স্বগতোক্তি করার মতো করে বলেছিলেন তিনি। মার্চপাস্ট দেখতে দেখতে, আমাদের চোখ একবার সারাবছর ধরে ফুটতে থাকা ফুলের গাছগুলোর দিকে চলে গিয়েছিল। আর একবার সমান করে কাটা ঘাসের দিকে। 'হ্যাঁ ওই ঘাস অথবা গাছের সাথে তুলনা করতে পারেন। একজন মালির সাথেই তুলনা চলতে পারে আমাদের।' অধ্যক্ষ বলেছিলেন সাথে সাথে।

আমাদের বুকের ওপর দিয়ে যেন গোখরা হেঁটে গেল এমনভাবে আমরা সামরিক বাহিনীর বন্ধুদের দিকে তাকিয়েছিলাম। আর মেজর জামান আমাদের চোখে মুখে রাষ্ট্রদ্রোহীভাব লক্ষ করে সাবধান থাকতে বলেছিলেন। তড়িঘড়ি আমরা ঘরে ফিরে ঘুমিয়েছিলাম। তাতে সংকট আরো বেড়ে গিয়েছিল। ঘুমের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম স্কুল প্রাঙ্গণের প্রাচীর দেয়া বিশাল অঙ্গনে কোনো শিশু নেই। ছয় বছর ধরে বেড়ে ওঠা বনসাই পড়ে আছে সারি সারি। এই দৃশ্য দেখার পর ঐ দিন দ্বিতীয়বার আমাদের বুকের ওপর দিয়ে সাপ হেঁটে গিয়েছিল, সাথে সাথে স্বল্পায়তন ঘুমটি ভেঙে গিয়েছিল। পরের দিন সামরিক বাহিনীর বন্ধুরা বলেছিল, আমাদের চোখ নাকি পুরোমাত্রায় রাষ্ট্রদ্রোহী বনে গেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছিলাম বলে ঘর বদল করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।

নতুন যে-স্থানটিতে ঘরভাড়া নিয়েছিলাম সেটি স্পর্শকাতর ছিল না। অধ্যাপকদের বাসাবাড়ি ছিল সেখানে। গ্রুপ গ্রুপ কলেজ পড়ুয়ারা সারাদিন যাওয়া আসা করতো। সারাক্ষণ রমরমা একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে এমন ভাবভঙ্গি ছিল এলাকাটার। বাসা নেয়ার ৪র্থ দিনে অধ্যাপক পাড়ার গোপিনাথ মোহান্ত সড়কে টাক মাথার এক অধ্যাপকের সাথে পরিচয়ও হয়ে গিয়েছিল। 'আসেন একদিন বিকালবেলা। চা খাবেন।' বলেছিলেন তিনি। তার সঙ্গের লোকটির দিকেও তাকিয়েছিলাম। 'চায়ের দাওয়াত রইলো। বিকালে আসেন একদিন।' তিনি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। সেদিন জানতে পারিনি, কিন্তু একদিন বিকালবেলা চা খেতে গিয়ে জেনেছিলাম তিনি হলেন ওই অধ্যাপকের ছাত্র।

'আপনাদের পেশাটা বুঝলেন, সার্বক্ষণিক নতুন কাজের। ক্লান্তিহীন কাজ। আমরা বড় বোরিং কাজ করি। খুব রিপিট করে। একুশ বছর ধরে একই সিলেবাস।'

বলে 'একটু আসছি' বলেছিলেন অধ্যাপক। এবং উঠে পাশের রুমে চলে গিয়েছিলেন। তখন ছাত্রটির কথা শুরু হয়েছিল– 'শিক্ষকতা পেশাটা আসলেই ভীষণ রিপিট করে, বুঝলেন, প্রতিদিন একই বিষয়ে কথা বলা কত বোরিং ভাবতে পারেন?' তখন শিক্ষকটি ফিরেছিলেন। এবং ছাত্রটিকে আমাদের জন্য নোনতা বিস্কুট আনতে বলেছিলেন।

'ছয় বছর ধরে আমার সাথে আছে ও। খুব ব্রিলিয়ান্ট। পদার্থ বিজ্ঞানে এ শহরে আমার পরে ওই আছে।' নোনতা বিস্কুট আনতে গেলে ছাত্রটির প্রসঙ্গে বলছিলেন তিনি– 'আমার হাতের নির্মাণ। তিলে তিলে গড়ে তুলেছি। ছয়বছর ধরে বেড়ে ওঠা বৃক্ষ বলতে পারেন। প্রথম দিকে খুব গ্রাম্য একটা ভাব ছিল। রাশিফলে বিশ্বাস করতো। ওর উদ্ভট চিন্তাগুলো বাড়তে দেইনি আর। আমার দার্শনিকতা দিয়ে সিক্ত করেছি ওকে।' এসব শোনার পর আমাদের পুরাতন বেদনাটা জেগে উঠেছিল। ম্যালামাইনের কাপে দেয়া চা বিস্বাদ লাগতে শুরু করেছিল। 'একটু কাজ আছে।' বলে অর্ধেক চা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। স্যাঁতস্যাঁতে সন্ধ্যাটা বেপাড়ার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেশ দেরীতে দৈনিকের অফিসে কাজ শুরু করেছিলাম সেদিন।

পরদিনও আমাদেরকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। গোপিনাথ মোহান্ত সড়কের চৌরাস্তার মোড়ে অপরিচিত একজন লোক অন্তত তা-ই বলেছিলেন।

'চারিদিকে এত বনসাই।' বলেছিলাম আমরা।

'তো কী? গোটা সংসারটাই একটা বনসাই তৈরির কারখানা।'

'সংসার' শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমরা তাকে দার্শনিক ভেবে নিয়েছিলাম। পরে অবশ্য তাকে সমাজতাত্ত্বিক বলেও ভুল হয়েছিল।

'কী করে?' আমাদের স্বভাবসুলভ প্রশ্নটি করে বসেছিলাম।

'এতগুলো লজ আর বাইন্ডিংস। ভাবেন আপনারা, প্রথম আইনটি যখন তৈরি হলো, তখন মানুষের একটি সম্ভাবনা কিন্তু বাতিল হলো। আর ধীরে ধীরে অসংখ্য অনুশাসন, অসংখ্য আইন। মানুষের অসংখ্য সম্ভাবনা বাতিল। তারপর সোসাইটি। সোসাইটি হলো স্বল্পায়তন একটি পাত্র। মানুষ অনুশাসনের ছুরি চালিয়ে নিজেকে সোসাইটি নামের টবে নিয়ে বসালো। মডার্ন সোসাইটি চায় এই স্বল্পায়তন পাত্রে থেকে চূড়ান্ত বিকশিত মানুষ। চূড়ান্ত শব্দটিও কিন্তু নির্ধারণ করে দেবে ইওর সারাউন্ডিংস। বৃক্ষের বেলা যেমন ঘরের তাপ, আলো, বাতাস নির্ধারণ করে দেয় কতটুকু বাড়বে গাছটি।'

'কী নাম আপনার?' প্রশ্ন করেছিলাম আমরা। তিনি মাছি তাড়াবার মতো করে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন– 'প্রশ্ন হলো, বনসাই শিল্প কিনা, প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রথমে সোসাইটিকে প্রশ্ন করছেন না কেন? যেটি আর সকলের কাছে শিল্প হিসাবে গণ্য সেটিকে আপনারা সন্দেহ করছেন। ভাবছেন না কেন আপনাদের শিল্পবোধের বিচ্যুতি ঘটে গেছে।'

'বনসাই আমাদেরকে ভীত করে তোলে।'

'পারিবারিকভাবে জীবন থেকে দূরে থাকার ফল এটা। হীনম্মন্যতা।' বলে নদীর দিকে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়েছিলেন তিনি। আর কোনোদিন তাকে অধ্যাপক কলোনিতে কিংবা গোপিনাথ মোহান্ত সড়কে দেখা যায়নি। কিছুদিন আমরা ভেবেছিলাম– তিনি অন্য কোনো শহর থেকে এসেছিলেন। পরে শুনেছিলাম শহরের স্থায়ী বাসিন্দা তিনি। বছরখানেক আগে কেউ কেউ নাকি তাকে দোকানে K-2 ব্রান্ডের সিগারেট খুঁজতে দেখেছিল। বাজার হতে একসময় হঠাৎ করে K-2 সিগারেট উধাও হয়ে গেলে তিনিও নাকি উধাও হয়ে পড়েছিলেন। অর্থনীতির প্রভাষক ছিলেন বলে শহরের তরুণরা তাকে K-2 স্যার বলে ডাকত। K-2 স্যারের কথামতো আমরা পারিবারিক জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। প্রাথমিকভাবে মধ্যম আয়ের একটি পরিবারে আমাদের যাওয়া-আসা শুরু হয়েছিল। সেখানে, পারতপক্ষে আমরা শিল্প ও বৃক্ষ নিয়ে কোনো কথা তুলতাম না। এমনকি পেশা নিয়েও নয়। আমাদের সম্মিলিত চেতনার আতঙ্ক সরাতে ভিন্ন কোনো উপায় ছিল না।

সময়ে অসময়ে আমরা থানাপাড়ার পারিবারিক জীবনে গিয়ে উপস্থিত হতাম। একদিন গিয়ে দেখা গেল গৃহকর্তা নেই। তার বিকল্প রূপেও কেউ আসলো না বসবার ঘরে। টিকটিকির মতো আধঘণ্টা নিষ্কাম হয়ে বসে থাকলাম। হয়তো আরো পনেরো মিনিট কেটে গিয়েছিল। এসময় নারীকণ্ঠে আমাদের উদ্দেশে বলা কথা শুনে চমকে গিয়েছিলাম। ঘড়িতে সন্ধ্যা সাতটা বেজেছিল দেখেছিলাম। 'এত আসেন ক্যান আপনারা।' খানিক রুক্ষ, বয়স্ক নারীকণ্ঠ ভেসে আসছিল পর্দার ওপাশ থেকে। 'আমরা ল্যাংড়া, নুলো, বনসাই আর স্কুল কলেজ ভয় পাই।' বলেছিলাম আমরা।

'বাড়িতে তিনটা সোমত্ত মেয়ে। ওদের চলাফেলায় অসুবিধা হয়।'

'অসুবিধা কী? আমাদেরও তো পারিবারিক জীবন দরকার।' পর্দার উদ্দেশে বলেছিলাম আমরা। ওপাশ থেকে বিরক্তি প্রকাশক শব্দ উঠেছিল তখন। কে যেন গৃহকর্তাকে বকা দিয়েছিল কটু শব্দে। 'মেয়ে তিনটাকে ছয় বছর ধরে গাছ বানাইছে। বিয়া দেওয়ার নাম নেই, আর ঘরে দ্যাখো ছেলেপেলেদের আনাগোনা।' সমার্থক কথা ভেসে আসছিল থেকে থেকে। মেয়েদের পর্দা ঠিক নেই বলেও আক্ষেপ করছিলেন মহিলাটি। এই মেয়েগুলোও ছয় বছর ধরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আর পরিমিত বাতাসে বেড়ে ওঠে বোধ হয়, ভাবছিলাম আমরা। তৎক্ষণাৎ একতলার অমিত্রাদির কথা মনে পড়েছিল। মেয়েগুলোকে পর্দা মুড়িয়ে ছয়বছর রাখার পর কেমন ফ্যাকাসে বনসাইয়ের মতো লাগছিল তা দেখার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিলো। আবার প্রবল ভয়ও ছিল ভেতরে ভেতরে। তাই কাউকে না জানিয়ে সোজা শহীদ বাবুরাম সড়কে চলে এসেছিলাম, ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে। পারিবারিক জীবনেও বনসাই থেকে দূরে থাকতে না পেরে আমাদের মনে আবার অমিত্রাদিকে দেখার বাসনা জেগেছিল। এমনকি ল্যাংড়া, নুলো, শিশু, ছাত্র দেখলেও ভীত হবো না এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। পরে গতানুগতিক শিল্পবোধে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে প্রচার করতে শুরু করেছিলাম– বনসাই হলো শিল্প। সে বৃক্ষের হোক বা মানুষের।

বড় রাস্তার উপরে একটা ট্রাক

আলো-আঁধারি সম্পূর্ণটা কাটে নাই। সুরুচির ছেঁকে ফেলা চা-পাতি, ডেনিশ কনডেন্সড মিল্কের ছয়সাতটা এক সাইড খোলা কৌটা, কাপের ভাঙ্গা ডানা, গ-াসের টুকরা, কাপ পিরিচ ধোয়া ময়লা পানি আর পরাটা ভাজার ছনাৎ আওয়াজের তিন হাত উপরে কেবল সূর্যের খানিক লালচে আভা। উল্টা দিকে মতলব বোর্ডিং। মাঝে শিউলি ফুলের মতো বড় রাস্তা। বোর্ডিং-এর সামনে তিনটা টাটা, একটা বেডফোর্ড, দুইটা আশোকলেল্যান্ড। ড্রাইভার-হেলপার কে কোথায় শুয়েছে, সুরুচি (হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট) থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। প্রতিদিনের মতো ট্রাকের আড়ালে ঢাকা পড়েছে মতলব বোর্ডিং-এর বেঞ্চটি। রাতভর ড্রাইভর, হেলপারদেরকে টানাটানি করে এখন বোর্ডিং-বয় দু'জনের চোখে ঘুম। বেঞ্চে বসে ঢুলতে ঢুলতে সেখানেই কোনোরকমে কাত হয়েছে ওরা। ওদের বেড়ালের মতো চার ব্যাটারি টর্চ দু'টি মাটিতে দাঁড়িয়ে অদূরে হাঁটু ভেঙে বসে থাকা সোলেমানের দিকে তাকিয়ে আছে জুলজুল করে। রাস্তা পেরিয়ে সুরুচি থেকে দেখলেও বোঝা যায়, ঝিমাচ্ছে না বরং একটু রেস্ট নেয়ার জন্য এই বসা। সম্ভবত মশা অথবা খারাপ স্বপ্নে পৌনে এক ঘণ্টা আগে তার ঘুম ভেঙে গেছে। তখন থেকে বেডফোর্ডের বডি ধোয়া এবং ওয়াটার ট্যাংক ভরাবার জন্য যতোবার সুরুচি টু বেডফোর্ড সে আপ-ডাউন করেছে ততোবারে বাবুর্চিদের কাছে তার একটা পরিচিতি তৈরি হয়ে যাবার কথা। শেষবার সে ছাই আনতে চুলার কাছেও গিয়েছে। আঙুলের মাথায় ছাই নিয়ে দাঁতে ঘষা দিয়েছে তিনবার। হাগা-মুতা সেরেছে মহাস্থান টিম্বার মার্টের পিছনে ঝোঁপ ঝোপ জায়গায়। অতদূর থেকেও বোঝা যায় এক্ষুনি আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াবে সে। একটা হাইও তুলতে পারে। সত্যই যখন সে উঠে দাঁড়ায় তখন বোঝা যায় ভেতরে কোথায় যেন কুয়াশার মতো তাড়া। বোর্ডিং-এর ছাদ থেকে দেখলে বেডফোর্ডের বডিতে ত্রিপল বিছিয়ে এবং মশারি টাঙিয়ে শুয়ে থাকা সোলেমানের ওস্তাদকে দেখা যায়। তার শুয়ে থাকার মাঝেও এক ধরনের তাড়া আছে। গত রাতে তিনটার দিকে এখানে পৌঁছে বাকি সময়টুকুর জন্য বোর্ডিং-এ ওঠে নাই তারা। তড়িৎ ব্যবস্থা করে দু'জনে ট্রাকেই শুয়ে পড়েছে। এখন সোলেমান যেভাবে কেবিনের পা-দানিতে পা ঠেকিয়ে বডিতে উঠে পড়েছে তাতে যে কেউ বুঝতে পারবে, সে এখন তার ওস্তাদকে ঘুম থেকে জাগাবে।

এহ হে... রে...এ আইজ যে ওস্তাদক ঢুলানিতে শুতি থাকা বাচ্চা ছাওয়ার মতন নাগে। দ্যাখো কেনে কী পরিমাণ সাইড দিয়া শুতছে। চলতি রোডত ফির উল্টা খাসলত ওমার। যতয় বাপের বেটা হন সাইড নাই। ওস্তাদ দয়া করলে না একনা সাইড পাইমেন। পারে না কি হে সোলেমান, ওমাক কাটাবার পারে নাকি কেউ? আছে নাকি কেউ? তাও আছে বটে একজনা। চোরের ওপর বাটপার আছে, নাকি বাহ। সেই ব্যক্তি হইল তোমার এই সোলে– সোলেমান। সেই দিনের কথা চিন্তা কর– যে দিন নিজের বেডফোর্ডখান নিয়া সে ওস্তাদের পিছনত নাগছে। পাগলা কুত্তার মতোন হর্নে হাত চাপি খালি গিয়ার মারতেছে। একবার ব্যাক সাইড মিররে ওস্তাদ তাক দেখেও বোঝায়। যায় নাকি ওস্তাদ, সোলেমানক চিনা যায় আইজ। উল্টা দিক থাকি এইসমে একটা বাস আসতেছে, ধরো। 'চুতমারানি' বলে একনা সাইড দিয়া সোলেমান ফির গিয়ার মারছে। ৬৯ গজটাক দূরে মানুষের কনুইয়ের মতোন রাস্তার এখান খাড়া ভাঁজ। হর্নে কিন্তু সোলেমানের হাত চাপি ধরায় আছে। আর ওস্তাদ এইসমে স্টিয়ারিং ঘুরায় না। স্টিয়ারিং ঘুরায় না কেন হে মানুষটা। হুটহাট গিয়ার কমায় সে। আর ওস্তাদ? সোত যেংকা পাথরত ধাক্কা খায় সেংকা করি একটা গগন শিরীষের গাছত ধাক্কা খায়া চুপ মারে ওস্তাদের ট্রাক। স্টার্ট বন্ধ করি ওস্তাদ, ওস্তাদ ডাকতে ডাকতে তার দিকে ছুটে যায় সোলে। ওস্তাদ– ও ওস্তাদ! উঁ বলে একটু পাশ ফেরে ওস্তাদ। সেভাবে দশ সেকেন্ড থেকে বালিশের নিচে হাত চালায় ঘড়ির খোঁজে। বাম হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ঘষে পাতা একটু খুলে সময় দেখে। টর টর করি দেখিস কী। এত বেলা হয়া গেল ডাকাইস নাই। নাকত তেল দিয়া নিন আলছিলু নাকি। খেকিয়ে ওঠে। তারপর ট্রাক থেকে নেমে যায়। বোর্ডিং-বয় দু'জনের ঘুম ভেঙে গেছে ততোক্ষণে। অযথাই ঘনঘন চোখে-নাকে বার বার আঙুল চালায় তারা। ওদের গা টাটানো হাসি দেখলে বোঝা যায় ওরা সোলেমানের এই অপদস্থ হওয়া গলা বাড়িয়ে খানিক দেখেছে। ওদের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে ওস্তাদের মশারি চাদর গুটিয়ে সাইড ব্যাগে পুরে দেয় সে। তারপর কেবিনে ছুঁড়ে দেয় ব্যাগটা। মিনমিনে শয়তান ছেলে দু'টা তখনো হাসছে।

বেডিংওত না থাকলে ওমার হোল জ্বলবেয়। থাকে বা কায়, পাঁচ টাকার বোডিংওত বিশ টাকা নাইট। টাকা কি রাস্তার ধুলা নাকি হে? ট্রাকের চোদনে উড়ি বেড়ায়। রাইতে বোর্ডিংওত থাক ত খুব ভাল। ওস্তাদ ওস্তাদ করবে। ট্রাক দেখবে। চাইলে নিজের বইনটাকও আনি দেয়। না ওঠো ত ওস্তাদ বাঁয়ে রাখেন– ওস্তাদ পিছনে রাখেন। আরো ট্রাক দাঁড়াইবে। চুতমারানি! ট্রাকতো তোমার শেরাটন হোটলে থাকবার জন্যে কাতারে কাতারে দাঁড়াইবেয়। ছেলে দুইটার দিকে তাকিয়ে হৈ দেয় সোলেমান। কিন্তু ওরা এবার তাকে পাত্তা না দিয়ে বোর্ডিং ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সুরুচির দিক থেকে হেঁটে আসা ওস্তাদের নাদুস-নুদুস পা ফেলা, শব্দ করে থুতু ফেলা এবং কেবিনে উঠে আগরবাতি জ্বালানো দেখে সোলেমান কেন গাড়ির চাকারাও বুঝতে পারে রাস্তার উপর আর একটা দিন শুরু হতে যাচ্ছে এখন। লা-ইলাহা ইল-া

আস্তা সুবহানাকা ইন্নিকুনতু মিনায যোয়ালেমিন বলে ওস্তাদ যখন চাবি ঘুরিয়ে পিকাপ চেপে ধরে তখন ঘুমন্ত নেড়ি কুত্তার মতো কাঁই কাঁই শব্দ করে বিরক্তি প্রকাশ করে ইঞ্জিন। পরক্ষণেই লাথি খেয়ে এক ধাক্কায় রাস্তায় সওয়ার হয়। ফটাফট মহাস্থান, পুণ্ড্রবর্ধন পেরিয়ে রংপুর রোডের উপর দিয়ে রংপুরের বিপরীত দিকে ছুটে যায়। এখন বোর্ডিং-এর ছেলে দু'টা যদি রাস্তায় গলা বাড়িয়ে ট্রাকটাকে এক নজর দেখতে চায় ত আরেকটা দ্রুতগামী ট্রাকে উঠে পড়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।

মাশাল-া রাস্তা এলাও ফাঁকা। কোনো বাস কার নাই। তামরা সবায় টার্মিনালের কোলাত বসি দুধু খাইতেছে। রাস্তাত খালি দুই তিনটা রিকশা। হইলে কী, এমার জন্যে সোলেমানক ধুপধাপ করা লাগে বেশি। এ পাকে ফির ওস্তাদক দ্যাখো। স্টিয়ারিং দ্যাখো। স্পিডোমিটার, ফুয়েলমিটার হাবিজাবি যন্ত্রপাতির কাঁপন দ্যাখো, মনে কয় একশ' তুলছে। এখন কেবিনে বসে সোলেমানের জায়গা থেকে দেখলে সামনের সাইকেল অলার প্রতি তার বিরক্তিটা স্পষ্ট বোঝা যায়। সাইকেল অলা সোলেমানের হৈ হৈ আর ধুপধাপ আওয়াজে রা করে না বরং রাস্তার বাঁয়ে যথেষ্ট জায়গা রেখে এগিয়ে যেতে থাকে। রাস্তা ঘেঁষা মানুষ বলেই এমন বিরক্ত করে এরা। চুতমারানি বলে এই নবাবজাদাকে ওভারটেক করে বিড়ি চায় ওস্তাদ। বিড়ি ধরানোর সময় ওস্তাদ যদি বায়ে তাকিয়ে একবার নজর করতো, বুঝতে পারতো তারও নেশা পেয়েছে। কিন্তু ওস্তাদের সামনে বিড়িতে অতিরক্তি একটা টানও দেয় না সোলে বরং ধরানোর জন্য যতোটুকু দরকার ততোটুকু টান দিয়ে ১১৪৩ এলফোর নাম্বারের হারাগাছে প্রস্তুত বিড়িটি ওস্তাদের দিকে এগিয়ে দেয়। এরপর কেবিনের দরজা খুলে বাহির থেকেই বন্ধ করে বডিতে উঠে পড়ে সে। খুব দ্রুত বিড়ি ধরায়। দ্রুততা সত্ত্বেও পিছনের ট্রাকে কলার উপর বসে থাকা লোক দু'জন তার নেশার তীব্রতা বুঝতে পারে না। মাথা ঘুরিয়ে সোলেমান বোঝে তীব্র বাতাসের তোড়ে এখনো এরা চোখ খোলা রাখতে শেখেনি। এ সময় ওস্তাদ একটা গিয়ার মারে আর সোলেমান কেবিন চাপড়ে তাকে উৎসাহিত করে করে বহুদূর এসে পড়ে। সে যদি এখন আবার কাঁচা কলা ট্রাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই ট্রাকের হেলপারদেরকে উপহাস করতে চায় তো ওই ট্রাককে অর্ধেক কলা নামিয়ে পাঁচটন মাত্র কলা নিয়েই একশ কি. মি. /ঘণ্টা বেগে ছুটে আসতে হয়। আর কাঁচা কলার ট্রাকের দিকে সে যদি মিনিটখানেক দেখে থাকে তাহলে বেডফোর্ডের পিছনের প্রাইভেট কারটাকে মোট দুই মিনিট হর্ন দিতে দিতে ওভারটেক করার সুযোগ খুঁজতে হয়। কিন্তু আর দেরি না করে ওস্তাদ প্রাইভেট বলে, কেবিনের উপরে একটা চাপড় মারে সে। এখন যদি কেউ পাশ কাটিয়ে যাওয়া প্রাইভেট কারটিতে না বসে বিপরীত দিক থেকে আসা ড্রাইভারের সিট হতে ওস্তাদের মুখ দেখতো তবে সহজে বুঝতে পারতো তার মুখে বিরক্ত একটা ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু সোলেমানের মুখে এই সময় একধরনের প্রশান্তি খেলা করে। কারণ ট্রাকে এই একটা মাত্র বিষয়ে ওস্তাদ তার কথা ফেলতে পারে না। বিরক্তিটা কাটানোর জন্যই সম্ভবত খাপেখাপে মিলিয়ে তিনটা ট্রাক আর একটা বাসকে ওভারটেক করিল আইজ।

এংকা করি আগতও গেইচে মাইলকে মাইল। কাইল হাত ছলকি গেল কেন তামার। সোলেমানের চউখ তখন তিরতির করি কাঁপতেছে, বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস। সোলে ওস্তাদের স্টিয়ারিং-এর পাকে দেখি আছে। তাজ্জব কথা, ওমার হাত একনা কাঁপিল না পর্যন্ত। খালি একবার কইলে, মানুষটা বোঝায় মরিল রে, সোলে। মরবারনেয় তা বাঁচপে নাকি হে? ডাইনের চাকাটা মাথার উপর দিয়া আসিল, আর মানুষটা বাঁচি থাকপে? বুকের ধড়াস-ধড়াস কমবার পর সোলেমান সামনত দ্যাখে দশমাইল মোড়। একটানে কেমন করি আইল কায় জানে।

একটা বাঁশের গাড়িকে আড়াআড়ি রাস্তা পার হতে দেখে মুখ খিস্তি করে সোলে। যদি কেউ সোলেমানের ভাবনার সাথে মিলেমিশে দেখতে চায় তো এই দু'তিন মিনিটে ক্ষতি কিছুই হয় না তেমন, সেটি বুঝতে পারে। কিন্তু এমন পরিস্থিতে খিস্তি করাই তার জন্য সংগত, নইলে কেবিন থেকে ওস্তাদের বাড়ানো গলা দেখা যাবে– 'নিন আলু নাকি সোলেমান, আরে হে সোলে।' নির্ঘাত বলে বসবে তৎক্ষণাৎ। এবার খিস্তি করার পরও ওস্তাদের বাড়ানো গলা দেখা যায়– 'সিংড়ার হাট আইজ; দেখি যাইস।' যারা নাটোর রোডের নিয়মিত যাত্রী নয় একথার সহজ অর্থটি তারা বুঝবে না। প্রতিটি ফাঁকা ট্রাকের ড্রাইভার এখানে যেমন এপাশ ওপাশ দেখে তেমনি ধানের ব্যাপারিরাও ট্রাকের খোঁজে উঁকি-ঝুকি মারতে থাকে সিংড়ার হাটের দিন। এমনও হয়, কখনো সিংড়া পৌঁছানোর আগেই ব্যাপারিরা রাস্তায় বিক্রেতাকে ধরে কেনাবেচা সেরে নেয়। তারপর ট্রাকে চালান করে দেয় নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা কি বগুড়াতেই। গত সন্ধ্যায় গোডাউন থেকে বেরিয়ে আজ সূর্য আকাশের কাঁখে উঠে বসেছে, এ পর্যন্ত কোন ট্রিপ মারা হয়নি তাদের। সোলেমানের ওস্তাদের পকেট গুনে আরো সহজে বলে দেয়া চলে এটা। নান্দীগ্রাম না আসতেই ব্যাপারিদের হাত উঠতে শুরু করে ট্রাক দেখে। পছন্দ মতো একজনের কাছে ট্রাক থামালে বডি থেকে নেমে দরদাম করতে যায় সোলে। পঞ্চাশ বস্তা ধান, নাটোর পর্যন্ত নয়শ টাকা ঠিক হলে ওস্তাদও নেমে পড়ে। কেবিন লক করে ব্যাপারিদেরকে ধান ওঠাতে বলে সোলে। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে হোটেলের দিকে যেতে থাকা ওস্তাদের পিছু নেয়। এখন বেলা যথেষ্ট টানটান হলেও হোটেল থেকে যে কেউ বুঝতে পারে এদেরকে পরাটার সাথে ডিমের মামলেটও দিতে হবে। হোটেলের বয়রা ডিম এবং পে-টের উপর পেপার, পেপারের উপর পরাটা সাজিয়ে আনলে তাদের দু'জনের খাওয়া শুরু হয়। এই নাস্তাটা কিন্তু এইখানে হবার কথা নোয়ায় বাহে। রংপুর পযন্ত একশ বস্তা আলুর একটা টিপ আছিল বীরগঞ্জ থাকি। কিন্তু সন্ধ্যা উৎরি যায়া বীরগঞ্চতে হইল একসিডেন। উয়ার পর যে গু-হাগা টান দিছে ওস্তাদ– ভাইও, পাবলিক খেপলে জান বাঁচে না। তা না হইলে রংপুর ট্রাক স্ট্যান্ডের পানাহার হোটেল এন রেস্টুরেন্টে রাইতে দেড়পে-ট বিরানি হইতে পারতো। কেরু এক বোতল আর সুগন্ধায় নধর (২৬) মালের সাথে সারারাইত চোদাচুদিও হইতে পারতো। কলেজ ইস্টুডেন। হোলনাইট তিনশ টাকা মাত্র। দেখো কোনঠাকার নাস্তা কোনটে হইল। রাস্তা খেদাইতে গেল সারা রাইতটা।

নাস্তা শেষ হলে পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধরায় ওস্তাদ। আরো আয়েশ করে বেঞ্চের উপর পা তুলে বসে। সোলেমান বেরিয়ে ট্রাকের দিকে যায়। এসব ক্ষেত্রে খাওয়া-দাওয়ার বিলটা ওস্তাদের পকেট থেকে যায়। আর সোলেমানকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনে তারা বলতে পারবে মাল ট্রিপ থেকে যে টাকা আসে সেদিকে কখনোই লোভ করে না সে।

সিংড়ার হাটবারে নাটোর রোড পেরুনো সহজ কথা নয়। গরু মহিষের গাড়ি আর মানুষের ভিড়ে রাস্তা জমাট থাকে। খানিক ফাঁকা রাস্তা দেখে ওস্তাদ যদি একবার গিয়ার বাড়ায় তো সাতবার কমাতে হয়। কিন্তু না মানুষ না ট্রাক কেউ কারো প্রতি বিরক্ত নয়। এই হাটের জন্যই রাস্তা, রাস্তার জন্যই হাট। ধীরে সুস্থে হাট পেরুলেই শিশু, মেহগনি, কড়াইয়ের নিচে ছায়া ছায়া পথ। একটানে নাটোর পৌঁছানো যায় অনায়াসে। দুই চারবার হয়তো কেবিনের ওপরে চাপড় মারতে হয় নইলে সারা রাস্তায় চুল গামছা উড়িয়ে সোলেমানকে বিড়ি টানতে দেখা যায়। ট্রাকের বিপরীত দিকে ছুটে যাওয়া ধোঁয়া বডিতে বসা নাটোরের কুলি কামলারা স্পষ্ট দেখে। তাদের নেশা হলেও তারা বিড়ি খেতে পারে না। তারা হয়তো সোলেমানকে সমীহ করে না। কিন্তু ট্রাকের দুলুনির টাল সামলাতে দু'হাতই ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে তাদের বিড়ি খাওয়া হয় না। সেলেমান ওদের অবস্থা দেখে হাসে। রাস্তার পাশে পাশে শংকিত পায়ে চলা মেয়েদের দেখে হৈ দেয় মাঝে দু'একবার। এই ফাঁকে একটা বরুণ টিপে কী মাথা চুলকাতে চুলকাতে চোখে ধরা একটা স্কুলের মেয়েকে পিছন ফিরে অনেকদূর পর্যন্ত দেখে নেয়। হাত-পাও ছাড়ি দিয়া সোলেমানের মতোন খাড়া হন না কেন! ভয় নাই– এই দ্যাখো। ঈগলের মতন আকশত উঠি পাখা ছাড়ি দিয়া থামি থাক। এংকা করি একে জোকার পিরান, একে রংগের ওড়না, কামিজ পিন্দা মাইয়া মানুষ, ইস্কুলের ইস্টুডেন দ্যাখেন না কেন! কারো দুধ দ্যাখো ডাব-ডাব, কেবল পাতলা একটা শাস পড়ছে কি পড়ে নাই। কারো ফির দ্যাখো বুক ফোটেয় নাই, বরাই বরাই। দ্যাখতে তো গোনা নাই! আছে নাকি? সোলেমানের ত বাড়িত পোষা বউও নাই। বউ যে আইজ হউক কাইল হউক হবাননেয় তাও নোয়ায়– স্টিয়ারিং হাতত আসলে তার পাছত ডাব-ডাব দুধঅলা শাবনূরের মতন একটা বউড় সোলেরও হইবে। নাকি পপির মতন, হে সোলেমান?

ট্রাকের সামনে একটা ভ্যান লটপট করছে। গতি দেখলে বোঝা যায় বড় ছ্যাচড়া ড্রাইভার। চালাতে পারুক না পারুক সহজে সাইড দিতে চায় না। ওস্তাদ ডানে গেলে সেও ডানে যায়। বামে গেলে বামে। যারা ওস্তাদের সাথে লংরুটে একদিনও চলাফেরা করেনি তারা বুঝতে পারবে না ওস্তাদের রোখ চেপে গেছে। হর্নে হাত চেপে ধরেছে সে। হঠাৎ যখন সে লক্ষ করল সোলেমান এখনো নিরুত্তাপ তখন খেকিয়ে ওঠে; কেবিনের জানালা দিয়ে খনিক গলা বাড়িয়ে 'নিন আলু নাকি রে হারামজাদা?' বলে। চকিতে সচেতন হয়ে সোলেমান কেবিনে চাপড় মারতে থাকে আর ভ্যানের প্রায় গা ঘেঁষে ওভারটেক করে। না নিন আইসে নাই সোলে। তাইলে ভ্যান খেদাইল

কেমন করি। নিন আইসে নাই– শাবনূরের রূপে ভুলা নাগছিল। সোলেমানেরও তো বউ নাগে নাকি ওস্তাদ! ডাব-ডাব। স্পিডোমিটার, ফুয়েলমিটার হাবিজাবি সুদ্ধায় চকচকা হওয়া নাগে। নাগে কি নাগে না?

নাটোরে ধান আনলোড করা হলে সরাসরি ট্রাকস্ট্যান্ডের উদ্দেশে স্টিয়ারিং ঘুরে যায়। ড্রাইভার হেলপাররা আজ পর্যন্ত ট্রাকস্ট্যান্ডের মতো অন্য কোথাও এত নিরাপদ বোধ করেনি। ওস্তাদেরও রেস্ট নেবার ইচ্ছা আছে, ট্রিপে পাওয়া কাঁচা টাকা খরচের বাতিকও আছে। নাটোর স্ট্যান্ডে পৌনে এক ঘণ্টা কেটে যাবার পর শ্রমিক সমিতির অফিসে যে লোকটি পেপার পড়ছে সে একটু চোখ তুললে ঝিম মেরে বসে থাকা ওস্তাদকে দেখতে পায়। আর নাক উঁচু না করেই যদি তার প্রশ্বাসকে সচেতন করে তবে বাংলামদে মেশানো স্পিরিটের গন্ধও অনায়াসে পেতে পারে। আর গলা বাড়িয়ে বেডফোর্ডের পিছনের চাকার দিকে তাকালে চাকার গায়ে হেলান দিয়ে থাকা প্রায় ঘুমন্ত সোলেমানকেও দেখবে। অবশ্য বাতাসের কারণে তার মুখ থেকে আসা স্পিরিটের গন্ধ পাওয়া সহজ হবে না। বেডফোর্ডটি তার থেকে আড়াআড়ি রয়েছে বলে পেপার পড়া লোকটি বুঝতে পারে না দৈনিক করোতোয়ায় বীরগঞ্জ সংবাদদাতা যে ট্রাকের নাম্বারটি এ পেপারে পাঠিয়েছে সেটি এদেরই। গতরাতে অ্যাকসিডেন্ট করার পর কেউ এমন নিশ্চিন্তে ঝিম মেরে থাকলে সন্দেহ না হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু স্ট্যান্ডে দু'জন না হোক অন্তত একজন নাম্বারটি লক্ষ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গুতো খায় সোলেমান। পাবলিক গাড়ির নাম্বার সাংবাদিককে জানিয়েছে। সোলেমান নিরুপায়, কিছুই ভেবে পায় না। সে এখন করবে কী? ওস্তাদকে জানানো ছাড়া কোনো বুদ্ধি খেলে না তার মাথায়। 'পোড়া মবিল দিয়া নাম্বার পে-টত একটা ঘষা দে।' প্রায় অন্যমনস্কভাবে সব শুনতে শুনতে কথার মাঝে বলে বসে ওস্তাদ।

ট্রাকটা হইল সোলেমানের ভাই। নাকি ভাইজান? তামারও তিয়াস নাগে। সেই জন্যেয় ওয়াটার ট্যাংকিত সকল-সন্ধ্যা দুপুর-বিকাল চপুরাইতে পানি ঢালে সোলে। আইজ তিয়াস বেশি নাকি হে ভাইজান? তাইলে একনা বাংলা দেই। বাংলার খালি বোতলটা ওয়াটার ট্যাংকের মুখে ধরে সে। দু'এক ফোঁটা তরল সেখানে পড়ে কি পড়ে না। কিন্তু বোতলটি বাষ্পে ভরে যায়। কেবিনের দরজা খোলার আওয়াজ হলে উপরে তাকায়। ওস্তাদ উঠে বসেছে। কভার নামিয়ে শব্দ করে সেঁটে দেয়। তারপর কবিরাজের হাতের সম্মোহিত পারদের মতন কেবিনে উঠে বসে। অভ্যাসবশত কেবিনের জানালা গলে বাম হাত বের করে ধুপ ধাপ চাপড়াতে থাকে চলন্ত ট্রাকের কেবিনে। পাকশি ব্রিজের নিচে ট্রাক-বাসের জ্যামে না পড়া পর্যন্ত একটানা ট্রাক ছোটায় তারা। মাঝে শুধু সোলেমান যখন লঞ্চের টোল দিতে নামে তখন খানিক সময় ব্রেক করেছিল ওস্তাদ। সোলেমান এই ফাঁকে যাত্রীবাহী বাসের হেলপারদের সাথে আড্ডা জুড়ে দেয়। লঞ্চের দোতলায় উঠলে হয়তো দেখা যেত পাঁচ টাকা বাজি ধরে তিন তাসের খেলায় দুইবার হেরে এক ফাঁকে লাজুক মতো একটা হাসিও হয়তো দিয়েছে সোলে।

লঞ্চ ভেড়ামারার দিকে ভিড়বে এই সময়ের কিছু আগে একটা মহিলা আসে সোলেমানের কাছে। ওস্তাদ জেগে ওঠা পর্যন্ত এই মহিলাটির আবেদন নিবেদন মন দিয়ে শোনে সে। ওস্তাদ উঠলে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে 'কি কবার ওমাক কন।' মহিলা ওস্তাদের কাছে গিয়ে তার আবেদন নিবেদনের পুনরাবৃত্তি করলে ওস্তাদ খানিক ঠারেঠারে বলে, 'বেটিছাওয়াটার তখনে তোর যে দরদ উছলি পড়ে হে এ সোলেমান।' মহিলা কুষ্টিয়া পর্যন্ত যাবে না। শহরের আগে মঙ্গলবাড়িয়া বাজারের পোয়া মাইলটাক আগে নামিয়ে দিলেই চলবে। বিনিময়ে সে কিছু দিতে পারবে না। দিতে যদি পারতোই তো ভেড়ামারা থেকে বাসে উঠতো। তার এতো অনুনয় বিনয় এজন্যই। দুধঝোলা সাতভাতারি রাস্তাখাকি মাগিগুলার কথা ত সোলেমান আর ওস্তাদের থাকি কম জানে না। এনা ভাল করি বুকের পাকে দেখমেন কি ঘামের গন্ধতে থাকায় যায় না। কালা কালটি একেবারে। নাক-মুখ ছয় সাত দিন ধুইছে কি ধোয় নাই। তবু মহিলাকে কেবিনের ভেতর নেয়া হলো। এবার অন্তত কুষ্টিয়া পর্যন্ত সোলেমানকে চালাতে হবে। ওস্তাদের যে এখনো ঘুমের রেশ না কাটা ভাব। ওস্তাদের গা ছুঁয়ে ছালাম করে স্টিয়ারিং ধরে সোলেমান। পিকাপ চেপে ধরে ধীরে ধীরে গিয়ার মারে। একটি বাসের পিছনে পিছনে পদ্মারঘাট থেকে উঁচু বড় রাস্তায় উঠে পড়ে। পরপর তিনটি গিয়ার বদলে যুতমতো সামনে তাকায়। ওস্তাদ যদি তার দিকে সেই থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো, বাইরে না তাকিয়ে, তবে বুঝতো এই ফাঁকে দু'বার তার এবং মহিলার দিকে তাকিয়েছে সে। মহিলা সম্ভবত সমীহবশত ওস্তাদের দিক থেকে সোলেমানের দিকে বেশি চেপেছে। এভাবে থাকলে সেকেন্ড গিয়ার বদলাবার ফাঁকে সে তার উরু ছুঁয়ে দিতে পারে। তা না করে 'একনা ওপাকে সারি যান।' বলে সোলেমান। পৌনে এক ঘণ্টা পরে মঙ্গলবাড়িয়া পৌঁছে বাজারের কিছু আগে ব্রেক করে। মহিলা নেমে গেলে কেবিন থেকে না নেমে স্টিয়ারিং-এর দিকে এগিয়ে যায় ওস্তাদ। কেবিন ঘুরে তার আগের জায়গায় ঘিরে আসে সোলে।

মজমপুর বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে জিলা স্কুলের পশ্চিমে গাড়ি থামায় ওস্তাদ। ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কের একপাশে ডান চাকা উঁচুতে রেখে পার্ক করে। তারপর শ্রমিক সমিতির অফিস। ওস্তাদ যদি আধ ঘণ্টা আগে এভাবেই (যেন কেউ নাই রুমে, এমন ভঙ্গিতে) প্রবেশ করতো তবে সহজেই বুঝতে পারতো সামনের চেয়ারে বসা সভাপতি তার অপেক্ষাতেই আছে। তার ট্রাকের মালিক খবরের কাগজ পড়ে হন্যে হয়ে টেলিফোন করে বেড়াচ্ছে সবখানে। রংপুর নাটোর করার পর আধ ঘণ্টাখানেক আগে এখানে টেলিফোন করেছে। কুষ্টিয়ার পুলিশ সম্ভবত এখনো জানে না। জানেও হয়তো-বা কারণ ট্রাফিক পোলগুলোতে এতক্ষণে খবর হয়ে যাওয়ার কথা। 'নাটোরিই যকুন বুঝতি পারলেন অবস্থা এরাম তা সেজাগাই মিটা আলেন না ক্যা?' সভাপতি ভৎর্সনা করল সোলেমানের ওস্তাদকে। 'বে-জাগায় পুঅিশির হাত উটলি বুজতেন। ওমনি, সোলেমান, যা-দেকিনি টিরাকডারে আমার গোডাউনি রাকে আয়।' একথা শোনার পরপরই সোলেমান যদি চাবি নিয়ে না বেরুতো, তবে শুনতো তাদের জন্য

বিকল্প হিসেবে খুলনা পর্যন্ত আরেকটি মালের ট্রাকের ব্যবস্থা আছে। মালিকের সাথে বোঝাপড়া হয়ে এ ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছে। বিপদ মুক্তির জন্য ট্রাকটিকে গোডাউনের ঘেরা চত্বরে রেখে এসে সোলেমান দেখে ওস্তাদের গোসল হয়ে গেছে। চুল ভেজা ভেজা। এখন শুধু তার গোসলটা হলে একত্রে মজমপুর হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্টে যেতে পারে তারা। খাওয়ার জন্য। খাবার সময় ওস্তাদের দিকে একবার তাকালে সহজে বোঝা যায় তার মন খচখচ করছে এখন। 'বীরগঞ্জের বিপদ যে কুষ্টিয়াতে আসি পিটটিবার ধরিল রে সোলে।' সোলেমান সম্মতি সূচক 'হ' বলে আবার খাবারের দিকে বেশি বেশি নজর দিতে থাকে।

যথাসময়ে কে একজন পিলার ভরা সাতটনী একটা টাটা এনে সমিতির অফিসের কাছে রেখে গেছে। এটাই এখন তাদের নতুন গাড়ি। সোলেমান ওস্তাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে ওস্তাদ কিছুতে সহজ হতে পারছে না এখন পর্যন্ত। তাকে উৎসাহ দিতে আগ বাড়িয়ে তেল, মবিল, পানি দেখে সোলেমান। তার মনে হয়– এটা তার সৎভাই। বেডফোর্ডের সাথে এর তুলনা চলে না। কোথায় ঘরের বউ আর কোথায় পরের ছউ।

সোলেমান ও তার ওস্তাদ যখন টাটার কেবিনে উঠে বসেছে এবং ক্রমাগত ট্রাকটি বড় রাস্তার উপরে উঠে আসছে তখন কেউ যদি পশ্চিমাকাশে মাগরিবের ওয়াক্ত খুঁজত, তবে বুঝতো, প্রায় বিশ মিনিট আগে অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করেছে। শহরের আলোর আড়ালে আড়ালে নিজেদের জায়গা খুঁজতে শুরু করেছে অন্ধকার। এক মিনিট আগে টাটার সামনে দু'টি, কেবিনের উপরে পাঁচটি, পিছনে দু'টি লাইট জ্বলে উঠেছে। কুষ্টিয়া থেকে চার মিনিট পর যদি কেউ হিসাব করতে বসে ত অনায়াসে বুঝতে পারবে টাটাটি ততোক্ষণে ঝিনাইদহ সড়ক ধরে চৌড়হাস পেরিয়ে গেছে।

সোমেন পালিত ও তার প্রতিপুরুষ

আক্ষরিক অর্থে সে, পরাজিত- একটি বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালো। এবং এখন সমস্ত ঘটনাকে প্রায় একপাশে সরিয়ে, খুব নিশ্চিতভাবে, শূন্যের মাঝে হাত মুঠো করে করতলে কিছুকে জড়ো করে, সমস্ত প্রশ্ন থেকে মুক্ত হয়ে যেন শৈশবকে অথবা কৈশোরকে ফিরে পেল। শূন্য মুঠো থেকে একটি বলকে অথবা কোনো গোলাকার বস্তুপুঞ্জকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, পরক্ষণে খপ করে ধরে পুনরায় ছুঁড়ে দিয়ে একেবারে গোধূলি পর্যন্ত সে, এই একই খেলা খেলতে থাকলো এবং শেষবার ঘনায়মান অন্ধকারে, শরীরের সমস্ত শক্তিকে হাতের মুঠোয় কেন্দ্রীভূত করে অদৃশ্য বলটিকে দ্রুত, যেন লাঞ্চারের মুখ থেকে রকেট, নিঃসীম আকাশে ছুঁড়ে দিলো- অসীম, অনন্তের দিকে। মাঠ থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নিলো, এক অর্থে তার জীবৎকালকেও নির্দিষ্ট করে দিয়ে সে, জীবনের কাছে ফিরে এলো এবং কখনো পৃথিবীর যে কোনো স্থানে পুনরায় সেই অদৃশ্য গোলকটির কথা মনে হলে, অর্থাৎ সেটি অনন্তের শরীর স্পর্শ করে বায়ুমণ্ডলে ফিরে এলে, সে, টের পাবে এবং লাফ দিয়ে উঁচু কোথাও উঠে খপ করে ধরে ফেলবে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার তাড়নামুখর গোলকটিকে- এমন নিশ্চিতভঙ্গিতে সে রিকশাঅলাকে বাসস্ট্যান্ডের দিকে পরিচালিত করলো। সন্ধ্যা সন্ধ্যাতেই তার– শহরে ফিরে গিয়ে ঢাকার বাসে ওঠা প্রয়োজন।

যখন প্রায় দশ বছর পর আবার সে এই থানা শহরে, তার স্কুল জীবনের সমাপ্তি যেখানে, গতকালকেই বিকেলের খানিক আগে ফিরে এলো, তখন সে জানেও না সোমেন পালিত বেঁচে আছেন কিনা তবু তাকে পেলে যেন মেরে ফেলবে এরকম জিঘাংসা নিয়ে ফিরেছিল। দশ বছরে আর চেনাই যায় না। পরিচিত রাস্তা, ঘরবাড়ি, দরদালানের ওপর ধুলো পড়ে ধূসরতর হয়েছে, স্মৃতিতে পূর্বেকার চঞ্চল সময়গুলোকে উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল, যেন সে দিনগুলোতে সবচেয়ে ম-ান সূর্যালোকও-এর চেয়ে উজ্জ্বল ছিল। দশ বছরে সূর্য তবে খানিকটা আলো হারালো নাকি?

এবং স্মৃতিও, যেখানে এসে মিলাবার কথা যে রাস্তার, তারা যেন মিলছে না অথবা মিলছেও হয়তো, নিজের কাছেই খুব স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে পারছে না সে, আখতার ফারুক। কখনো এখানে যেন থাকেনি, অথবা থেকেছে- স্বপ্নে দেখেছে কি! দোকানের নেমপে-টগুলোর দিকে তাকালো, ঠিকই আছে, বাস তাকে ভুল জায়গায় নামিয়ে দেয়নি। ঠিকই আছে, খুব নিশ্চিত ভঙ্গিতে নিজের কাছে বলতে চাইলো, বলতে পারলো না– উত্তেজিত, অস্ফুট গুনগুন বেরুলো শুধু। উত্তেজনাও হয়তো বলা

যায় না একে। কেমন হয়েছেন সোমেন পালিত এতদিনে কে জানে। স্মৃতিভ্রষ্ট হলে তো কথাই নেই। 'স্মৃতিভ্রষ্ট সোমেন।' জিহ্বায় বিড়বিড় উঠলো। শিক্ষকেরা নাকি নিজের অনুগত ছাত্রটিকে নয়, সবচেয়ে বদমাশটাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখে। বাস থেকে নেমে চা খেতে খেতে এসব ভাবছিলো; দুপুরের খাওয়া অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছিলো, চা'র সাথে দু'টো কেক এবং পানি, আয়রন বেশি, স্কুল জীবনেও এমন ছিল কিনা মনে করার চেষ্টা করলো। চিন্তা ঘুরে গেল আবার। যেন সোমেন পালিতই একমাত্র পরিচিত তার এই থানা শহরে? তাই কি? চাইলে অন্য দু'একজনের খোঁজ নেয়া যেতে পারে। অথবা হোটেলে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে তারপর সোমেন পালিতের খোঁজ। 'বরং এখনি'- বললো শব্দ করে।

একটা রিকশা ডাকলো, 'স্কুল'- বললো, পরক্ষণে স্কুলের পুরো নামটা মনে করার চেষ্টা করলো। সোমেন পালিত বোধহয় চিনবে না, আবারও মনে হলো। নতুন দু'টো ভবন উঠেছে, টিচার্স লাউঞ্জ নতুন দোতলার ২য় তলায়। একজন দেখিয়ে দিলো। তাদের সময়, প্রত্যেকেই খুব আপন করে বলে, আমাদের সময়, 'আমাদের সময়...' আখতার বিড়বিড় করলো, পরের শব্দগুলো মনে এলো না, তবে ভাবটা বোঝা গেল- এমন ছিল না। আরো ঘনবিন্যস্ত, পুরনো, খুব পারিবারিক মনে হলো তার আগের অবস্থাটিকে। এখন খুব বেশি অফিসিয়াল। টিচাররাও হয়তো তাই হয়ে গেছে। সোমেন পালিতও। ঘাঘু সোমেন, লম্পট সোমেন, অংকের জাহাজ, অবিশ্বাসী, বদমাশ সোমেন, আখতারের বন্ধু সোমেন, শিক্ষক– পিতা সোমেন। সেও আন্তরিক আছে নাকি তেমন? সে, তিনি, সোমেন।

'সোমেন পালিত আছেন?' লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসা জুনিয়র টিচার একজনকে জিজ্ঞেস করলো। খুব অমায়িকভাবে। যেন এখনও স্কুলের ছাত্র। আবারও নিজের বলা বাক্যটাকে হাতড়ালো- স্যার বললো না? পালিত স্যার। নিজের কাছেই খুব ভারাক্কি শোনালো– সোমেন পালিত। 'আছে। আমার সঙ্গে আসেন।' বিস্ময়কর কিছু ঘটলো না। চেনাচিনির প্রসঙ্গই উঠলো না। অর্থাৎ এ রকম আরও ঘটেছে, পুরনো ছাত্র আসতেই পারে। আসেও হয়তো কেউ কেউ, নিয়মিত। অন্য একজনের সাথে কথা বলছিলেন, তার আদাব গ্রহণ করে, ইশারায় বসতে বললেন শুধু, আগের সূত্র ধরে বলে চলেছেন পূর্বোক্তের সাথে। আর এই সোমেনকে কিনা, বলা চলে খুনই করতে এসেছে সে। 'ভালো তো?' কথার ফাঁকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলেন, শত ফাঁদ পেতেও সোমেনকে ধরা যায় না। নাকি গভীর চিন্তাটির সূত্র ধরে ফেলেছেন, যেমন আগে হতো? সোমেন পালিত যাদুকরের মতো অন্তঃকরণের মাঝে সেঁধিয়ে যায়। ভাবলো আখতার। চুলে ভীষণ পাক ধরেছে, হাসিটি মধুরতম হয়েছে। সিক্সটি পার করেছে নাকি?

তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ছোটখাট, আখতারের চেয়েও। 'এবার নিশ্চিন্তে মরে যেতে পারলে বাঁচি। এই অঢেল জীবন...' যেন এইমাত্র সোমেন পালিতও নিজেকে গুটিয়ে আনলো। নিশ্চিন্তে মৃত্যুর জন্য। পৃথিবীর সর্বশেষ ব্যক্তি, যে

এইভাবে, এখন, গুটালো নিজেকে। বাক্য শেষ করলেন না... বাক্যের অবলেশটুকুর দিকে তাকালো সে, আখতার। 'এরপর আবার কী?' বলে চললেন, 'সেইটা ভাবিওনি কোনদিন। তুমি তো জানো, আর ভাববার দরকার আছে?' উত্তর দিলো না আখতার, বাতাস থেকে কথাটিকে ধরে এনে আবার কানে ঢোকালো 'তুমি জানো' অতীতকালীন কোনো ঘটনাকে নির্দেশ করা হলো এই বাক্যে। কিন্তু, তুমি জানো, সচেতনভাবে বললেন কী? তার মুখের দিকে তাকালো। তাকালেই মুখের সঞ্চরণশীল ভাবটুকু গোপন করে ফেলতেন সোমেন পালিত, এখনো করলেন। এখনো তার উদ্দেশ্যে কোনো কথা বলেনি সে। এবার বললো যেন তাকে নয় এই শহরকে উদ্দেশ্য করে। 'শোনো' মুখের দিকে তাকালেন, এখানে ওখানে হাজারটা ছাত্র আছে আমার। অহংতাড়িত কণ্ঠ তার। তাচ্ছিল্য করা। 'তোমার চেয়ে জ্ঞানবান, ক্ষমতাবান- কাছে পিঠেই আছে, ডাক দিলেই আসতো। তাদেরকে মনে রাখিনি। আমি সোমেন পালিত বলছি। কিছু ফিরিয়ে নেবার জন্য আমি দিই না। কিন্তু আমি জানি তুমি পরাজিত। তোমার মুখ দেখলে আমি বুঝি। আমার প্রিয়তম, অথচ পরাজিত খুব বেশি ছাত্র নেই। তুমি এই গ্রহটাকেই দলিত করে দিতে পারতে। পারনি। ভুলেও কখনো এদিকটা মাড়াওনি। তুমি দূরে সরে গেছ। আমার নিজের কাছেও তুমি, তোমরা, খুব বড় একটা প্রশ্ন। সোমেন পালিত নিজেকে ভুললেও এই প্রশ্নটিকে ভুলতে পারে না।'

অনেক কম আশা করেছিল। তাই প্রশ্ন করেছিল তাকে চেনা গেছে কিনা। আরও কঠিন হলো– অন্তত তার জন্য। এত বোঝে যে সোমেন সে এটুকুও বুঝবে হয়তো। তখন, মনে মনে ভয় হলো তার। সোমেন পালিতের কাছে সে খুব ছোট আকারের কীট হয়ে থাকবে? বরং চলে যায়। এক্ষুণি বাস ধরে– বিকেলে ট্রেনও থাকতে পারে। এতো শৈশবের ভয়- সোমেন পালিত যেন তাকে হত্যা করলো– তার বদলে। সিদ্ধান্ত টা আসতেই দিলো না। না, সোমেন পালিতের সামনে কোন নমনীয়তা নয়। একটা সিগ্রেট কিনলো। যেন দশ বছরের সীমালংঘনের অধিকার একটি সিগ্রেটে এসে ঠেকলো। অথচ চমৎকারভাবে সেটাকে এড়ালেন তিনি। হঠাৎ অনেক কথা। বলতে শুরু করলেন... অনেক কথা... একমাত্র মেয়েটাও যে মানুষ হলো না... উচ্ছন্নে গেল সেকথা। 'আমার সাথে বছর আধেক দেখা-সাক্ষাৎ ছিল।' মাঝখানে খুব চিন্তাভাবনা করে একবার সিগ্রেটে টান দিয়ে আখতার বলেছিল। 'জানি।' বলে দীর্ঘ নৈঃশব্দ তৈরি করলেন।

'তখন তো তোমার সাথে আমার আর যোগাযোগ নেই। আদর্শ-ফাদর্শও না। নিজের তৈরি করা ভ্যলুজগুলোও যদি সে মেন্টেইন করতো।'

মনে পড়লো, তার, মাঝখানে দশ বছর- তবু 'সে' সত্যিকার একটা সেতু ছিল সোমেন পালিত আর তার মাঝে। পরে আর যোগাযোগই হলো না। শর্টফিল্ম করতে নামলো। কানাডা গেল, এনজিওতে টাকা কামালো।

সোমেন পালিতের চোখের দিকে তাকালো। মিল আছে। অথচ কী আনন্দমুখর ছিল প্রথম দিনের পরিচয়। 'হি-হি হো-হো-হো, বাবা তাহলে আপনার মাথাটা

ভালোভাবেই খেয়েছে। হি-হি-হি।' কী যেন নাম?

বসবার ঘরে তাকে বসিয়ে নিজেও একটা চেয়ার টানলেন। 'তেমনি আছে না? বাড়িতে আমি কিন্তু একা। রান্নার লোক আছে। স্নান করে খেয়ে রিল্যাক্স করো, পরে কথা কবো।' বিকেলে, দাবার সেট নিয়ে হাজির। কিছুক্ষণ পর ঝালমুড়ি আর চা দিয়ে গেল। দাবা সাজিয়ে একটা চাল দিয়ে বসে থাকলেন তিনি। তার খানিকটা দেরি হয়ে গেল। একটু ধীরেসুস্থে খুব পাকা খেলোয়াড়ের মতো তাকে মেপে নিলেন। 'নিজেকে গুছিয়ে নিতে আর কত সময় লাগবে? গুছিয়ে নাও।' দাবার দিকে তাকালেন। 'আমাকে দেখ', একটা চাল দিলেন, 'আমি প্রথমে গুছিয়ে নিয়েছি। তারপর জীবনে এমনভাবে ঢুকে গেছি', আরেকটা চাল দিলেন, তাকালেন– 'আর পেছনে তাকাতে হলো না। ক্ষতি কী মেয়েটা মানুষ হয়নি– দায় তো আমার একার না– বিশাল সম্পত্তি হয়নি। তবু এই অঢেল জীবন...' আবারও বাক্য অসমাপ্ত রাখলেন।

সে চাল দিলো। সোমেন পালিতের ঘোড়াটা খেয়ে নিতে নিতে বললো– 'বারবার পেছনে ফিরে তাকিয়েছি আমি। পিছুটান। কারণ,' তার দিকে তাকালো 'কারণ, কিছুই করতে পারিনি। কারণ, বাসনা-আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করেছি।' এই বাক্যটাকে জুড়ে দিলো মোক্ষম অস্ত্রের মতো। যেন থমকে গেলেন। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় চোখ ছোট করে আনলেন। আখতারের সিগ্রেটের প্যাকেট তার দিকেই বাড়িয়ে দিলেন। 'আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করেছ'- অনেকক্ষণ চুপ করে দাবার দিকে তাকালেন 'পাপ-পূণ্য?' হাসলেন। 'না'- খুব দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলো– 'আরও বড় কোন কিছুর জন্য!' 'আমাকে দেখ', তার চোখের দিকে তাকালো নিশ্চিত হবার জন্য, 'আদর্শ হলো সোমেন পালিত– যে জীবনকে দলিত-মথিত, লাঞ্ছিত, বাঞ্ছিত করে গেছে। আমি কিন্তু আদর্শ সবার। তুমি।' বুড়ো আঙ্গুল দেখালেন। 'কিছুই পাবে না। জীবনের মধ্যদিয়ে যাওয়াই শুরু করলে না। নিষ্পাপ শিশুর মুখে পাপ-মুক্তির বচন। হাহ!' একগাল হেসে নিলেন। 'এই ব্রত তোমার জন্য নয়।'

অপমানিতের মতো তাকালো। হঠাৎ যেন আবার গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে খেলতে থাকলো। 'আখতার।' মিষ্টি করে ডাকলেন, 'আখতার ফারুক'। সমস্ত জীব ও জড়ের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার নাম জগৎ। আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর নাম, আকাশ-নক্ষত্র, নারীর নাম। তুমি তো মৃত। তুমি নাকি আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করেছ। হাহ!'

'পাপ-পূণ্য নয়– ধরেন আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করাও নয়'। তাকালো তার দিকে। তাকিয়ে থাকলো– 'হিয়ার, য়্যু হ্যাভ ডান সো মেনি ক্রাইমস টু দ্য মানকাইন্ড– খুব বস্তুগত অর্থে।' বলেই ফেললো। কথাটার প্রতিধ্বনির দিকে তাকালো। তার নিজেরই কান ঝাঁঝাঁ করতে থাকলো। ক্রাইম, সোমেন পালিতের, ক্রাইমের কথা উঠলো আবারও। আজও কি ছলকে যাবে সোমেন পালিত, পিছলে যাবে।

'একটা খেলা চলছে, ভুলে যাচ্ছ কেন?' চমকে উঠলো সে। প্রসঙ্গ ঘোরাতে চলেছেন। পরে বুঝলো, কথাটা দ্ব্যর্থক। 'একটা খেলা চলছে। তুমি-আমি, আমি-ও, সে-তুমি। তুমি কর্তা আর বিশ্বসংসার কর্ম– এটা ভেবো না। তারও কিছু করার

আছে। তুমি করলে– না করলেও। যখন তুমি ক্রাইম করলে না– সেই মুহূর্তেই তোমার প্রতি শ্রেষ্ঠতম ক্রাইমটি সংঘটিত হতে পারে। এই খেলাটার কথা ভুললে চলবে না।' নৌকা খেয়ে নিলেন। 'আকাঙ্ক্ষা তোমার একার নয়, সকলের, তোমার প্রতিপক্ষেরও।'

এবার সে আটঘাট বেঁধে নিলো। সোমেন পালিতের রাজাকে চেক দিতে। 'স্যার'– বললো সে, 'ধরেন একবার, অন্তত একবার, আকাঙ্ক্ষা আপনার থাকলো, অন্য ব্যক্তিটি কর্ম। আপনিই ক্রাইমটি করলেন। আজ নয়, কাল নয়– সে মৃত্যুর আগে এসেও যদি বলে– সোমেন য়্যু হ্যাভ ডান আ ক্রাইম টু মি। তখন? অথবা তাও বললো না। তার মৃত্যুর আগে...,' 'চেক স্যার' 'সে শুধু একবার ভাবলো– অনেক কাল আগে, সোমেনের রূপে, গুণে, ক্ষমতায়, দক্ষতায় মোহিত হয়েছিলাম। সোমেন সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এই কথা ধরেন শিরিন, ধরেন নমিতা, একদিন এই প্রশ্ন করলো নিজের কাছেই। উত্তর দেবার মতো কেউ রইলো? য়্যু হ্যাভ নো ডিফেন্স, তখন কিভাবে আপনার ক্রাইম খণ্ডন হয়।' 'এই প্রশ্ন তোমার কাছ থেকে আসবে। আমি জানতাম।' রাজা সরিয়ে নিলেন। 'এত তাড়াতাড়ি, ভাবিনি। আর কিছু না হোক। প্রশ্ন করতে শিখেছিলে। চোখাচোখা প্রশ্ন ভালোবাসতাম বলে তোমার ওপর নজর গিয়েছিল আমার।' আবারও গুটি এগিয়ে দিলো। অতটা সহজ নয়, আবারও পালালো। আজীবনের সাধনা দিয়েও যদি তাকে বিস্মিত করা যেত। ভেবেছিলো, শিরিন, নমিতার কথা শুনলে নরম হয়ে স্বীকার করবে। অপরাধবোধ আসবে। কিন্তু পাকা খেলোয়াড়। 'যাদের কথা বললে তারা এই শহরেই আছে। রাস্তাঘাটে দেখা হয় না তাও নয়। চোখে-মুখে তাদের কখনো কোনো আপত্তি দেখিনি। কোনো হিংসা, আক্রোশ, অনুযোগ। নেভার।' চা দিতে বললেন আবার। বাড়ির ভেতরে বাথরুমে গিয়ে প্রস্রাব করে আসলেন।

'তুমি, আখতার ফারুক- যাকে ক্রাইম বলছো তা ছিল প্রায়শ্চিত্ত, তুমি সাক্ষ্য দাও মহাকালের কাছে– সোমেন পালিতের মূর্তি এত গাঢ় প-াস্টারে গাঁথা, ঝরবে না। যদি তা না হতো- পরীক্ষা দিতে পারতো না তারা। কেন সুযোগ গ্রহণ করবো না? অন্যথা হলে তো পাণ্ডা দুইটা, ওদের বাপ, আমার মাথা ফাটাতো। খেলা তুমি একা খেলবে- তা হয় না, এটা আমার প্রতিশোধ ছিল। আমিও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছি- এই অপরাধ? ওটাও অপরাধ। কোনটা ম্যানকাইন্ডের প্রতি আর কোনটা নয়, এ বিবেচনা তুমি সারাজীবন ধরে করো।'

'এরকম অসংখ্য ক্রাইমের ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমি। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। সমগ্র পৃথিবীটাই। কারণ সকলেই আকাঙ্ক্ষার উপর দাঁড়িয়ে আছে। তুমি– তোমার মতো...।' বাক্য অসমাপ্ত রাখলেন। দাবা অগোছালো করে বললেন। 'তুমি জিতেছ।' এই হলো সোমেন পালিত। আখতার জিতলো, তবু বুঝতে দিলো না তাকে। রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করবে বিজয়, তা হতে দেবে না। এই সোমেন পালিত কাউকে, কোন শকুনকে নিজের লাশের ওপর লাফাতে দেবে না। নেভার। আখতার ভাবলো,

বললো নিজেকেই, আমি তো তার লাশের ওপর নাচতে চাইনি। জীবনের মর্মার্থ খুঁজতে আমি এসেছি। চা এলো। এরপর বৈকালিক ভ্রমণের প্রস্তাব দিলেন। বিকাল? সন্ধ্যাই তো। কোথাও হেঁটে আসা যায়। বললেন, 'চলো, পাশেই এক ছাত্রের বাড়ি, ওর বাবা-মাও আমার ছাত্র ছিল। চলো ঘুরে আসি। ওসব বাদ দাও।' হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করলেন। তোমার য়্যুনিভার্সিটি জীবন গেল, কলেজ জীবন গেল, সেসব গল্প বলো। বলতে গেলে আমি তোমার শৈশবের বন্ধুই তো।'

আখতার বললো না কিছু। তাই আবার তিনি– 'আমরা একইসাথে একটি তীব্র সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেছিলাম। তখন যৌবনে...। পাপপূণ্যহীনতার সৌকর্যকে ধারণ করতে চেয়েছিলাম। মনে আছে?' 'মনে আছে' থেকে ভাবতে শুরু করলো সে। মনে তো আছেই এবং সম্ভবত মনে থাকার কারণেই, সে আবার এলো। সোজা সোমেন পালিতের কাছে। বাসার বাইরেটা রঙ করে– বেশ নতুন করে তুলেছেন, রাস্তা থেকে– একটু দূর থেকে দেখলো। 'হেঁটেই যাই। কী বলো'। 'একটু ভুল হলো–' বেশ খানিকটা সময় চুপ থাকার পর বললো। 'সেটা হলো', থামল সে– চোখের সামনে থেকে কী সরালো- 'একসঙ্গে কথাটি ভুল। আপনি আগেই খোঁজ পেয়েছিলেন-আমাকে শুধু প্রস্তুত পথটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।'

তাকালেন তিনি এবং খুব গভীরভাবে, একবার দাঁড়িয়ে চলতে থাকলেন। অর্থাৎ মেনে নিলেন। 'এ জন্যই, আবার ফিরলাম– অন্য অনেকের কাছে যেতে পারতাম– দর্শনের কাছে– জানি আপনি অভিনয় করেন না– তাই জীবনের কাছেই সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এলাম–'

'এবং আমাকে হত্যা করতে'। কথার পৃষ্ঠে কথাটি বসিয়ে দিলেন, ভাগ্যিস খুব মোক্ষম উত্তরটি তৈরি আছে- ভাবলেন তিনি, সারাজীবন যা আমি চর্চা করে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রমাণ করবে? আমার তো জীবনবাজি রেখে লড়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু কিছুই বললেন না। শুধু 'আমাকে হত্যা করতে' বলে থামলেন। পাত্তা না দিয়ে কথা চালালেন। 'না, পাপপূণ্য নয়। ক্রাইম, অপরাধ সেটা খুব ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার হতে পারে, গোপন। তবু, যে ক্রাইমটা আমি করলাম- আমার আকাঙ্ক্ষা আর বাসনার বশবর্তী হয়ে। যার প্রতিবিধান রাষ্ট্র, আইন, বন্ধু, সমাজ কেউ করতে পারলো না– সেই ক্রাইম? তুমি বলছো, এ ধরনের ক্রাইম আমার অসংখ্য তাই আমার বিচারটা কী?

ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি, রিজনেবল হও– আহা যুক্তি, কিন্তু তোমার হত্যা করার আকাঙক্ষা-বাসনাকে আমি চরিতার্থ হতে দেব না।' ততোক্ষণে তার হাত কলিংবেলের বাটনে, প্রায়ই আসেন বোঝা যায়, তার দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙ্গুলে চাপ দিলেন।

'এদেরকে চিনবে হয়তো তুমি। তোমাদের দুই ব্যাচ নিচে ছিল মেয়েটি। সুনয়নার সঙ্গে।' চমকে উঠলো। কিন্তু, চমকালো কেন? খুব সাবধানে খেলেছে সে। তবু। জানে, দশ বছর কেন, বিশ-ত্রিশ কেটে গেলেও সোমেন পালিত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

তাকে এই বাড়ির কলিংবেল টিপে দরজা খোলার অবসরে, দাঁড়িয়ে বলতেন- 'এদেরকে চিনবে হয়তো তুমি। তোমাদের দুই ব্যাচ নিচে ছিল মেয়েটি। সুনয়নার সঙ্গে।'

পুরুষটি দরজা খুললো। 'আরে কাকাবাবু যে!' 'ডাক তো দীপ্তিকে, দেখুক কাকে নিয়ে এলাম।'

দীপ্তি এলো, পুরোদস্তুর সংসারি দীপ্তি, সুনয়নার প্রাণসখী। অবাক হয়ে দেখলো আখতারকে। একটু কাছে ঘেঁষে জিজ্ঞেস করলো, সুনয়নার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয় কিনা।

'না', খানিকটা অস্বস্থির সুরে বললো, সোমেন পালিতও হয়তো লক্ষ করলেন। একটা অস্থিরতা তাকে প্রায় গ্রাস করে রইলো- এটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন হয়তো। এরপর তিনি ঘাঘু, নাছোড়বান্দার মতো সারাসন্ধ্যা সুনয়না সুনয়না করতে করতে গলা ফুলিয়ে ফেললেন।

সকালে, সুনয়নার ছবির একটা অ্যালবাম নিয়ে এলেন, পাকা খেলোয়াড়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন ঘুম হলো।' সে তাকালো, এই বুড়ো বয়সে তারপক্ষে এত নিরুপদ্রব, চাপ-ঘুম দেয়া কিভাবে সম্ভব, ভাবলো।

অ্যালবামটা হাতে দিলেন। সুনয়নার ছবিতে ভরা। সুনয়না দাঁড়িয়ে, সুনয়না বসে, সুনয়না শৈশবে, সুনয়না কৈশোরে, যৌবনে সুনয়না, মাঠে, পিকনিকে, বাড়িতে, বাবার সাথে, বন্ধুর সাথে, ফ্রক পরে, স্কুলড্রেসে, শাড়িতে, সুনয়না, সুনয়না, সুনয়না। সমুদ্রের ধারে সুনয়না, পেছনে মেঘ সুনয়না, সামনে ক্ষেত সুনয়না, গম্ভীর-বিষণ্ন-উচ্ছল সুনয়না। চা নিলেন, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসলেন, 'তুমি না এলে আমি তোমার কাছে যেতাম একবার। অন্যভাবে উল্টো প্রশ্নটা করতে।' ভাবলেন, কাল যথেষ্ট সাবধানতা দেখিয়েছ। যেন তোমার আমার মাঝে কোনো সুনয়না ছিল না। 'বিদায় অভিশাপ পড়েছে?' খুব নিষ্ঠুর হলো কথাটা। এবার আরও নিষ্ঠুর– 'আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করেছ, পৃথিবীর আর সকলে কি করেছে সেটা? তোমার প্রতি যদি কারো আকঙ্ক্ষা বর্ষিত হয়। সেই আকাঙ্ক্ষার হত্যাও তো অপরাধ।'

ইচ্ছা হলো সোমেন পালিতের চোখে চোখ রাখে। পিতা সোমেন পালিত। মেয়ের কথা আলোচনা করছেন। কিন্তু ছবিগুলোর দিকেই তাকালো। ওভাবেই রইলো। সত্যিই তার চোখ-জীবন্ত, ছবিতেও।

'শেষবার কী বলেছে সে জানো, বলেছে বাবা আমি তো অসুন্দর, দেবযানী, অচরিতার্থ। আর প্রথমবার আবার যখন তোমার দেখা পেয়েছে– তুমি নাকি মেঘের চেয়েও সোনালি। বলেছিল, তুমি নাকি তার অকৈশোরের। বাবা, তোমার এই মুসলমান ছাত্রটিকে ঘিরে আমার আকাঙ্ক্ষা ডালপালা ছড়িয়ে দিলে...' 'আমি বুঝেছিলাম, মুসলমান শব্দটার ওপর জোর ছিল তার, জানতাম, তোমার দিক থেকে অসুবিধা হবে না। আমি হেসেছিলাম' বলে একটু হাসলেন, 'কিন্তু প্রথম অসুবিধাটা তোমার দিক থেকেই হলো।

সে তো উচ্ছন্নে গেল শেষ পর্যন্ত।'

'সুনয়না ঘুণাক্ষরেও জানায়নি তো!' তাতে কী- সে তো জানতো, বুঝতো অনুভব করতো– আর এড়িয়ে চলতো, ভাবলো সে।

'আমার বিরুদ্ধেও কেউ সাক্ষ্য দেয়নি?' চোখের পাতায় তুড়ি বাজালেন। তাহলে যে খেলাটা তার এবং সোমেন পালিতের মধ্যে চলছিলো তা কি ড্র হলো। ভাবলো। তাকালো তার দিকে। কিন্তু তাই বলে, শেষ তো হয় না সব। অনেকক্ষণ চুপ করে তাকলো। স্কুলে যাবার কথা উঠলো। সে শহর ঘুরে স্কুলে তার সাথে দেখা করে চলে যাবে, বললো। 'থাকো না কিছুক্ষণ, এই বুড়োর সাথে'– বললেন। প্রস্তুত হয়ে এলেন। সেও। বেরুলো এক সঙ্গে।

'পেছনে ফিরে তাকাইনি-জীবনের মধ্য দিয়ে হুমমুড় করে চলে গেছি। কৃতকর্মের যোগ্যতর ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই, এই জীবনেই আছে। তবু ভালো লাগে। এই অঢেল জীবন। প্রায়শ্চিত্ত, শান্তি।'

'যদি না থাকে। এটা কি প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম?' এ প্রশ্ন এখন তার এবং সোমেন দু'জনেরই।

সারাদিন ঘুরলো। পুরনো জায়গাগুলোতে। বাজারে, রাস্তায়, নদীর ধারে। নতুন করে আবিষ্কার করতে চাইলো স্মৃতিকে। এখন শুধু সুনয়না। উচ্চারণ করলো। ঐ শব্দের সাথে সাথে যতো ঘটনা ভেঙেচুরে চলে আসে মনে করলো। বুঝেছিল সে। স্পষ্ট বুঝেছিল। সুনয়নার ভ্রান্তিপাশে জড়ানোর ছল। কেটে যাবে– ভেবেছিল। ভাবেওনি খুব একটা। এখন নয়, পরেও নয় একদম শেষে সে যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একবার তার কথা ভেবে– তাকে অপরাধী করে তোলে। দুপুরে সোমেন পালিতের সাথে খেলো বাইরে। কাল ভুলে ছিল, আর আজ বুঝলো সোমেন, শুধু সোমেন পালিতই নয়, সুনয়নার বাবাও। একটু সংকুচিত হলো সে। সংকুচিত করে নিলো নিজেকে। সোমেন পালিতও।

উদ্দেশ্যহীন কথা চললো কিছুক্ষণ। নিরুত্তাপ। বিকেলে ছাড়লেন তাকে। রিকশায় উঠিয়ে দিলেন। 'চুকে গেল সবকিছু', হাসলেন, 'আর নিশ্চয়ই খোঁজ নেবার প্রয়োজন হবে না।' মুষড়ে পড়লেন। প্রিয় সোমেন পালিত। তার দিকে তাকালেন। কঠিন সোমেনের চোখে জল। ভুল, হয়তো তারই চোখে। সোমেন কঠিন লোক।

'তোমার আকাঙ্ক্ষা তোমার, আমার আকাঙ্ক্ষা আমার। কিন্তু আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষার সমাহার এই জগৎসংসার।' রিকশা চলতে থাকলো। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। একবার পিছন ফিরে তাকালো। তখনও দাঁড়িয়ে তিনি। তাকিয়ে, তার প্রস্থানবিন্দুর দিকে। কিন্তু বাসস্ট্যান্ড থেকে ফিরলো আবার সে। রিকশা থামিয়ে, সোমেনের কাছে নয়, একটা সেগুন গাছের নিচে বসে থাকলো। সন্ধ্যার আগে স্কুলের মাঠে ফিরে এলো। ফাঁকা স্কুলমাঠ। শুধু একটা পরাজিত বেঞ্চ। প্রথমে বিষণ্ন ছিল। তখন স্কুলে সোমেন পালিত নেই। বিষণ্নতা থেকে ধীরে ধীরে উৎফুল- হয়ে উঠলো। উৎফুল- হয়ে, উঠে দাঁড়ালো বেঞ্চের ওপর। আক্ষরিক অর্থে পরাজিত। তবু আনন্দে...

জিসম

শরীর বিষয়টি শুরু থেকে আমার জীবনে ভীষণ আলোচ্য একটি প্রসঙ্গ হয়ে থাকলো। এ বিষয়ে অবশ্য আমার যৌবনের গুরু সৈয়দ আমাকে মাঝে মধ্যে বকাবাদ্য করেন। তিনি তরুণদের বিশাল অংশের মেয়েদের উরুতে হাত রেখে জীবন অতিবাহনের বেদনায় ব্যথিত। এদের যে সমাজ-সভ্যতায় কোনো অবদানই রইলো না এ নিয়ে তার আফসোসের কমতি নাই। আমি তর্কের খাতিরে গুরুর সাথে তর্ক করি। নইলে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটা অধীনতামূলক মিত্রতা হয়ে পড়ে। সম্পর্কের ডায়ালেকটিকসটা ফোটে না। বলি, কী কও গুরু, আমি তো দেখি শরীরেই আরাম। সব শাস্ত্র ঘেঁটে এসে হে পণ্ডিত, নারীতে আরাম। গুরু কয়, এইটা কী কইলি? জীবনের অভিজ্ঞতার কথা যদি ধরিস, তবে বলি, তোদের বয়সে নারীর শরীরকে মনে হইতো শরাবান তহুরা, বেহেশতের শরাবের নদী; সে শরাব আমি গেলাসে গেলাসে পান করেছি। এখন কী মনে হয় জানিস? স্রেফ একটা চকলেট-লজেন্সও যদি মনে হইতো তাহলেও হইতো। আমি বলি, তবে তো সেই একই ঘটনা ঘটলো গুরু। যুগে যুগে গুরুরা শিষ্যকে একই কথা বইলা আসলো আর শিষ্যরাও থোড় বড়ি খাড়া ওই গুরুর যৌবনকালের দিকে ধাবিত হইলো। আমি একটা কথা কই গুরু, যদি কিছু মনে না নেও তবে সত্য হইলো– ওইটা তোমার প্রৌঢ়ত্বের সত্য আর এইটা আমার যৌবনের সত্য। যুগে যুগে গুরুরা ওই এক কথা কইয়া গেল। আর শিষ্যরাও উল্টাপথে– মদন রসে মন মজালো। গুরু বুঝে আমি যা বলি তাই করি। তাই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কন এই কারণেই পৃথিবীটা এইখানে আইসা পৌঁছাইলো। আমি দেখলাম গুরু হতাশ। এটা সহ্য হওয়ার নয়। তাই এইবার গুরু-শিষ্য মিলে পৃথিবীর বর্তমান ভোগবাদীতাকে গালাগাল করতে থাকি। এই ফাঁকে পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি– আমার নাম রাকেশ, গুরু বলেন রাক্ষস। আর গুরুর নাম সৈয়দ, আমি কিছু বলি না। গুরু গৌরবর্ণ, চক্ষু বড়– গোলগোল চকচকে, হাইট ভালো, আমি আর গুরু যখন রাস্তায় হাঁটি তখন মনে হয় গুরু দোতলা বাসের ছাদ থেকে কথা বলছে। এই নিয়ে লোকে রঙ্গ-তামাশা করে। তা করুক, তথাপি গুরুর একটা জিনিস কিন্তু লোকে তেমন একটা জানে না। সবাই ভাবে তিনি আমার অ্যাবনরমাল ফ্রেন্ড, উনি বিদ্বান ব্যক্তি, অমায়িক, মিশুক। আর পারতপক্ষে যৌন বিষয়ে হয়তো একটা কথাই তাদের মনে হয় যে,

আমার গুরুর ধোন নাই। বন্ধু-বান্ধব জিজ্ঞেস করে তোর সৈয়দের বয়স কত? সঠিক বয়স বলতে গুরুর নিষেধ। এমন কি সাল-বিহীন জন্ম-তারিখও বলা চলে না, তাই বলি– এ্যারাউন্ড ফিফটি। তবে তো ওনার খাড়ায় না, কি বলিস? এই কথার সদুত্তর হয় না। কিন্তু মোক্ষম একটা উত্তর দিতে হয়, তাই বলি– 'যাইও'। গুরুর যেসব বিষয় লোকে জানে না সেগুলো একে একে বলি। তারও আগে বলা দরকার এই গল্পের ভূমিকাটা কী। অর্থাৎ কী বিষয় নিয়ে এই গল্প তৈরি। সে ২০০৩ সালের জুন মাসের কথা। আমার জীবনে একটা ভয়ানক প্রলয় উপস্থিত হলো। সামান্য একটা ভুলের জন্য সমস্ত বন্ধু আমাকে ছেড়ে দিলো। ঘটনা কিছুই না, এক পার্টি-ফার্টি কিছু হবে। জেলা শহরেও আজকাল এগুলো হয়। ড্রিঙ্কস কিছু ছিল। ড্রিঙ্কস করলে আমি একটু জ্ঞানী-জ্ঞানী কথা বলি, তাই বন্ধুরা আমাকে ওভারডোজ করে দিলো। আমার তখন হঠাৎ একটা হিন্দি গান মনে পড়ে। সবলোগ পিতে হ্যায় শরাব পানি মিলাকে, ম্যায় তো পিতে হ্যায় শরাব জওয়ানি মিলাকে। বন্ধুরা ওয়াহ ওয়াহ করে উঠলে আমার উৎসাহ বেড়ে যায়। প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখি, পার্টিতে বন্ধু-স্ত্রীরাও উলে-খযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত ছিল। মফস্বলের মেয়েরা এইসব ব্যাপারে একটু বেশি ফাস্ট। ওই হিহি হো হো আর খোলামেলা পোশাক-আশাকে। আসরটাকে আমি হিন্দি সিনেমা নাকি হলিউডি সিনেমাই ভাবলাম জানি না। একে তো মদের ঘোর অন্যদিকে মহিলাদের সেক্সি আউটলুক। মরার ওপর খাড়ার ঘা। হাতের কাছে এক বন্ধু পত্নীকে পেয়ে কিস বসিয়ে দিলাম। আর যাবে কোথায়? ওই ঝাকানাকা ফাস্ট মেয়েও ফোঁস করে কেঁদে দিলো, তার স্বামী মদের বোতল বাগিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসলো। পার্টি ফার্টি লাটে উঠে বিচার সভা বসলো। আমার গরম মাথা হিম হয়ে আসলো। এই মুহূর্তে সেটা অসঙ্গত বিধায় আমি যারপর নাই মাতলামি করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত আমাকে মাতাল অবস্থায় মাফ চাইতে হলো, আর আমি যেহেতু অবিবাহিত তাই এইসব আসরে আমাকে নিষিদ্ধ করা হলো। সেই থেকে আমি বন্ধুবিহীন। এবং সবার অলক্ষে গা ঢাকা দিয়ে শহরে থাকি। বেনাপোল থেকে একটা ইন্ডিয়ান ভিসিডি পে-য়ার আনিয়ে সারাদিন হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি ছবি দেখি, গান শুনি। টিভিতে ডিশের লাইন আছে। সারাদিন চ্যানেল ঘুরাই আর বিড়ি-সিগারেট ফুঁকি। সেক্সের ধান্দা বাদ, কেননা তলে তলে বয়স তো আর কম হলো না। এই বয়সে এত ঝক্কি আর সইতে পারি না। তাই হাত মেরে যা হয় তাতেই সই। এইভাবে জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর গেল। আমি জ্ঞান পিপাসু। ফলে যা হওয়ার তাই হলো– বর্তমান সিনেমা-বাজার নিয়া আমার বিস্তর জ্ঞান জমলো। জ্ঞানের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে– সেটা হলো, একটুখানি জমলেই তা পেটের বাহির হওয়ার জন্য আকুপাকু করে। কী করি কী করি। কেউ আমার দিকে ফিরে তাকায় না। হয়তো ভাবে, লোকসমক্ষে যদি তুমি চুমু খাইতে পারো তোমার কাছে আড়ালে ভদ্রলোকের বউ ছেড়ে দিলে কী হবে? আমি এইটুকু বলার অবকাশ পাই না যে– ভাই আমি অতো খারাপ লোক না।

এই খারাপ সময়ে আমার জীবনে সৈয়দের আবির্ভাব। কোন বংশের সৈয়দ কে

জানে। সন্ধ্যাবেলা মনটা এমনিই একটু আকুপাকু করে তাই মাঠের মধ্যে বসে ছিলাম। চারদিকে হালকা অন্ধকার। গোধূলির আলো মিলিয়ে যাবে যাবে। এমন সময় ফাঁকা মাঠে আমার সামানে অপরিচিতি এক ব্যক্তির আবির্ভাব। বলে, আপনার মধ্যে তীব্র যৌন আতৃপ্তিবোধ আছে। আমি ভাবলাম, কে এই ব্যক্তি যে একেবারে চিন্ত ার গভীরে সেঁধিয়ে যায়। হতচকিত হয়ে তার দিকে তাকাতে চাইলাম কিন্তু অন্ধকারে মুখ দেখা গেল না। রবীন্দ্রনাথের মণিহারা গল্পটির কথা মনে পড়ে গেল। আমিও তাকে পরখ করে নিতে চাইলাম। কোনো কথা বলে চুপচাপ তার দিকে তাকালাম, তারপর আবার আগের মতো উদাস বসে থাকলাম। জীবনে এত ঘাট মাড়িয়েও– এত বন্ধু এত প্রেম তবু তৃপ্তি এলো না তো? ভেবেছিলেন আপনার মতোই আশপাশের দুনিয়া– দেখলেন তা নয়– এখন একা এই মাঠে বসে ভাবছেন জীবনের তবে কী মানে আছে? গা কাড়া দিয়ে উঠুন। শিড়দাঁড়া টানটান করে দাঁড়িয়ে পড়ুন। সত্যি বলতে কী, একটা বল পেলাম যেন তার কথায়। বললাম, আপনি কে? কী আপনার পরিচয়? উনি বললেন, আগে আলোয় চলুন। সেই পরিচয় সৈয়দের সাথে। প্রথম দিনেই গুরু মানলাম। সম্বোধনে সে দুই ধাপ আমি একধাপ নিচে নামলাম। তুই-তুমি। মাঝে-মধ্যে অবশ্য ফ্লাকচুয়েট করে। তুই-তুমি। তুমি– তুই। হাজার হলেও গুরু বলে কথা। সৈয়দের মানসকাঠামো বিশে-ষণ করলে দেখা যায় সে ২৫% আইডিয়ালিস্ট + ১৫% লিবারেল– ডেমোক্রেট + ১০% উপযোগবাদী + ৩০% বন্ধু অন্তপ্রাণ + ১০% অলস + ৫% শরীরী + ৫% স্বার্থপর। পড়াশুনায় ভয়াবহ সামন্ত তান্ত্রিক। আমার ব্যাপারে সৈয়দের মূল্যায়ন হলো– আমি ৫০% শরীরী + ২৫% অশরীরী + ২৫% মার্কসবাদী। মার্কসবাদ কী জিনিস আমি জানতাম না। সৈয়দই প্রথম আমাকে মার্কসবাদ বিষয়ে জানালো। এরকম একজন আধা-বুর্জোয়া আধা-সামন্তবাদী কিভাবে আমাকে মার্কসবাদের মতো বিধ্বংসী দর্শনের খোঁজ দিতে পারলো ভেবে আমি অবাক। পরিচয়ের সপ্তাহ কি পক্ষকাল পরে একদিন গুরুর বাড়িতে গেলাম। বাড়ি দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। গ্রন্থময় এক বাড়ি। দান্তে , তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, গ্যাটে, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ– এইসব লেখকের খণ্ড খণ্ড ভরা। টীকাভাষ্য, উপনিষদ, বাইবেল, ইত্যাদিও আছে। এক কথায় বলা যায়– সমাজের আধুনিক যুগে প্রবেশের পরের আর কোনো বই তার বাড়িতে ঢোকেনি। যাই হোক, আমি বিস্মিত এবং খানিকটা হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। লাঞ্চের পর তাকে ধরলাম, গুরু ক্লাসিক পড়ো ভালো কথা, কিন্তু এত হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে আধুনিক যুগের সাহিত্যের ছিটেফোঁটাও নাই এইটা কেমনে হয়। গুরু বলে সবটা এতেই আছে। অর্থাৎ কিনা আধুনিক সাহিত্যে যা আছে, এগুলোর মধ্যেও তাই আছে। সত্যি কথা বলতে কি, শিল্প বিপ-বের পর পৃথিবীতে ক্রিয়েশন বলতে কিছু হয়নি। সবই এন্টারপ্রেটেশন। আমি খোঁচানোর জন্য বললাম– তুমি ভীষণ সামন্তীয়। এইটুকু বলে আমি থামলাম– কেননা এইতো তার সাথে শেষ কথা নয়। আর একটা কথা। একটু পড়াশোনা না থাকলে আলাপ ঘন হয় না।

যাই হোক, সৈয়দের মাধ্যমে আমার সিনেমা-জগতে দাসযুগ আর সামন্তযুগের কিছু বইয়ের অনুপ্রবেশ ঘটলো। রীতি অনুযায়ী আমার বাড়িতেও সে এক দুপুরে লাঞ্চে আসলো। আমার সংগ্রহে অসংখ্য সিডি দেখে তারও চক্ষু চড়কগাছ। বয়স হয়েছে। তবু যৌবন, যৌনতা ও ফ্যান্টাসির এই অসামান্য উৎসার কার না ভালো লাগে। তাকে আমি জিসম ছবির কথা বলি। বলি যে, জিসম মানে হলো শরীর। এ ছবিটা সামনে মুক্তি পাবে। এতে অভিনয় করবেন বোম্বের টপ মডেল বিপাশা বসু। ধারণা করা হয় শি ইজ ওয়ান অফ দ্য সেক্সিয়েস্ট এ্যান্ড মোস্ট সেনসুয়াস গার্ল ইন দ্য অরিয়েন্ট। উই আর ওয়েটিং ফর হার লেটেস্ট আউট-বার্স্ট। সৈয়দ বলে তুমি আছ পুঁজিবাদের প্রোডাক্টের রিয়েলিটির জগতে। ইট ইজ সাম শর্ট অফ হাইপার-রিয়েলিটি। এখন তোমার আর আমার বন্ধুত্ব হইতে হইলে দরকার মার্কস আর এ্যাঙ্গেলস। প্রোডাকশন রিলেশন বুঝতে সেই থেকে আমার প্রগতি প্রকাশনীর বই পড়া শুরু। আমি বই আনি, গুরু সিডি নিয়ে যায়। এইভাবে আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে ওঠে। একদিন আমি ভাবি এই যে অসম বন্ধুত্ব, এইটা কেন? সৈয়দকে একটা পরীক্ষা করা যাক তো। তো, একদিন আমি রাত্রে তার বাসায় থাকি। পরীক্ষা করি ছেলে ছোকরার পাছা মারার তাল আছে কিনা। এই বয়সে এমন ভীমরতি দেখা দিতেই পারে। বলাবাহুল্য সৈয়দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। এখানেও সে আইডিয়ালিস্ট। মেয়ে ছাড়া লাগায় না। এরপর তার সাথে আমার যৌন বিষয়ে খোলামেলা কথাবার্তা হতে শুরু করলো। আমি আমার হিস্ট্রি বললাম। সে বললো, আমি তোমারে আর হিস্ট্রি আর বলি না। বরং আসো আমরা একটা সাইকোলজিক্যাল গেম খেলি। তোমারে আমি আমার এক পুরানা বন্ধুর কাছে নিয়া যাই। তুমি ওর কাছ থেকে আমার হিস্ট্রির একটা অংশ জাইনা নাও। তবে শর্ত থাকে, তুমি জেলাস হইতে পারবা না। এই কথা হয়ে থাকলো। তথাপি আজ যাই কাল যাই করে করে তার বন্ধুর বাড়ি আর যাওয়া হয় না। আমিও সৈয়দকে ভরসা রেখে এদিক সেদিক একটু ভাগ্য টেস্ট করতে থাকি। গুরু মধ্যযুগ থেকে এক নায়ককে ধরে এনে আমার সাথে তুলনা দেয়। বলে, এই খাই-খাইপনার নাম হলো ডন জুয়ানপনা। গুরুর ভর্ৎসনায় আমার মন কঠিন হয় না। মেয়ে দেখলে মাল মাথায় ওঠে। ভদ্রলোকের স্ত্রী-কন্যা কেউই বাদ যায় না। এই দেখে ভদ্রলোকেরা আমার কাছ থেকে ১০০ হাত দূরে থাকে। পারতপক্ষে আমার সাথে তাদের স্ত্রী-কন্যার পরিচয় করায় না। আমার এই গতিক দেখে গুরু ব্যথা পায়। বলে, রোসো। এইভাবে ক্রিয়েটিভিটির বারোটা বাজানোর অধিকার তোমার নাই। একটা উদ্বেগবিহীন সেক্সুয়াল লাইফ দরকার তোমার। কালকেই তোমারে আমার বন্ধুর বাড়ি নিয়া যাই। উদ্বেগবিহীন যৌনজীবনের সাথে বন্ধুর বাড়ির সম্পর্ক কী। গুরু বলে, রোসো। গুরুর পীড়াপীড়িতে একদিন তার সঙ্গে শহরের দক্ষিণ দিকে রওনা হলাম। ধরা যাক, তার বন্ধুর নাম রেবেকা বা লতা। আসল নাম এখানে উহ্য থাক। অবশ্য তাতেও কিছু আসে যায় না। পাঠিকারা অবগত যে গল্প– গল্পই। যথারীতি পুরানা ধাঁচের বাড়িটিতে আমরা ঢুকে পড়লাম, বসবার ঘরে বসেও পড়লাম। সম্প্রতি

দেখা জিসম ছবিটি আমার দেখা ছিল। দেখলাম সাক্ষাৎ বিপাশা বসু হেঁটে আসছেন। আমার নাম লতা। সৈয়দ বলল, ও বন্ধু; আমি বললাম, রাকেশ। সৈয়দ প্রথমেই একটা গভীর পাঁচ মিনিটের চুমু এবং আমার সামনেই লতার দুধ থেকে নিয়ে পাছা পর্যন্ত হাতিয়ে ফেললো। এরাউন্ড ফোর্টি। বোঝার উপায় নাই। ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। আমার অবস্থা বলার মতো নয়। লতা না রেবেকা না বিপাশা আমাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন এবং সৈয়দের গাল কামড়ে একেবারে লাল করে ফেললেন। হঠাৎ তাকে ছেড়ে আমার দিকে নজর দিলেন। ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করলেন। কোথায় থাকি কী করি ইত্যাদি। সৈয়দ ততোক্ষণে দাঁড়ানো থেকে সোফায় বসে পড়েছে, লতা না বিপাশা না রেবেকা দাঁড়িয়েই ছিলেন আলুথালু বস্ত্রে। গুরু তাকে হোতকা টান মেরে কোলে বসালেন। একটানে ব-াউজ খুলে নিপল চুষতে আরম্ভ করলেন। উনিও খুব সিরিয়াসলি আমার সাথে কথা চালিয়ে যেতে থাকলেন। আমার তখন মৃত্যুময় অবস্থা। এর চেয়ে আমাকে উলঙ্গ করে রডের বাড়ি দিলেও হতো। আমি জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারির শীতে ঘামছিলাম আর কাঁপছিলাম। ভেতরে শ্বাসকষ্ট টের পাচ্ছিলাম এবং মনে হচ্ছিল আমি তক্ষুনি মারা যাব। তারা যখন আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লো তখন আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। এই বিশাল ফাঁকা বাড়িটিকে আমার একটা ডাইনির বাড়ি বলে মনে হলো। যে ডাইনি শুধু পুরুষের রক্তই পান করে চলে ক্রমাগত। আমি স্তম্ভিত, নির্বাক ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। সৈয়দ আমার ঘাড়ে হাত রাখলে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তারপরও তার দিকে তাকাতে পারিনি। ফিরতে ফিরতে বলেছিল, এতো আধুনিকমনা ছেলে তুমি। সিনেমা দেখ, এক্স-ফেক্স কিছু বাদ দেও না। দেখলা তো সইতে পারলা না। জেলাস হইলা। শোনো, তোমারে তিনটা কথা বলি–

ক. শরীরের বাস্তব ও অধিবাস্তব এক ব্যাপার নয়। তোমার শত-সহস্র হাইপার-রিয়েল চর্চা তোমাকে শরীরী মূল্যবোধের বাইরে টেনে আনতে পারে না।

খ. শরীর এমন এক দুর্গ যা সব সময় মরচে পড়া তালা দিয়ে বদ্ধ থাকে। যার চাবি কখনোই তুমি খুঁজে পাও না। দুর্গে ঢুকতে হলে তালা ভাঙতেই হয়। এ এমন এক দুর্গ– কেউ নিয়মিত যাতায়াত করলেও তা তালাবদ্ধই থাকে অন্য সবার কাছে। অন্য কেউ পুনরায় তালা ভেঙে ঢুকে পড়লে দুর্গ কিছুতেই আর তোমার থাকে না।

গ. শরীর সব সময়ই ঈর্ষা, ক্রোধ, হিংসা, জিঘাংসা আর জুগুপ্সার বসতি।

আমি তর্ক করার মতো অবস্থায় ছিলাম না। সত্যি কথা বলতে কি তার কথার প্রতিবাদে আমি কেঁদে ফেললাম। সৈয়দ বলল, আমার সাথে চল। তোকে আজ এক অদ্ভূত জিনিস পড়তে দেব। ভেবেছিলাম সে আমাকে মার্ক্যুইস দ্য সাদ পড়তে দেবে। কিন্তু খাওয়ার পর রাত্তিরে তার রিডিংরুমে সে যে গল্পটা আমাকে পড়তে দিলো তা হলো– ক্রোয়েটজার সোনাটা। গুরু ওষুধ জানে। আমার মাথা এক্কেবারে ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

পরদিন ভোরবেলা সৈয়দ আমাকে জাগিয়ে তুললো। অত্যধিক শীতের সকাল

ছিল সেটা। সৈয়দ পথ্যও জানে ভালো। গরম কফিতে একটু ব্রান্ডি মিশিয়ে খেতে দিল। তাতে আমার চেতনা ভেতর থেকে সাড়া দিলো। আমি গুরুর দিকে তাকালাম। সে ইতিমধ্যে ান সেরে নিয়েছে। বললো, রাকেশ আসো আমরা একটা গেম তৈরি করি। খেলাটা এই যে– তুমি জীবনের যে জায়গায় আছে সেখানে আমি পৌঁছাবো আর আমি যেখানে আছি সেখানে তুমি আসবা। ধরা যাক, মাঝখানে একটা দেয়াল আছে, এইটা রেবেকার শরীর। আমি সেখানে পৌঁছে গেছি। তুমিও পৌঁছাও। আসো আমরা পরস্পরকে ক্রস করে স্থান বদল করি। আমি বুঝি গুরু কী বলতে চায়। আমার সেক্সুয়াল লাইফে এটা নতুন ঘটনা। গুরু কি দেবতা নাকি? একবার পজিটিভলি ভাবি আবার পিছিয়ে আসি। নৈতিকতায় আঘাত লাগে। শেষমেষ বলি, এইটা কী কইলা গুরু। উনি তোমার বন্ধু। আমার শ্রদ্ধার পাত্র, তুমি পাগল হইয়া গেছ। আমার সামনে আর এই ধরনের কথা বলবা না। তুমি বরং এক কাজ করো, আমারে কিছুদিন মার্কসবাদ শেখাও। কম্যুনিজমে দীক্ষা দেও।

দেখলাম গুরু রাজি। তাই পরবর্তী তিনমাস আমরা কম্যুনিজম চর্চায় ব্যস্ত থাকলাম। গুরু মার্কস-এঙ্গেলসের নির্বাচিত কিছু বই আমাকে পড়তে দিলো আর সপ্তাহে সপ্তাহে পাঠচক্র শুরু হলো দু'জনের। আমরা যথাক্রমে পুঁজির বিকাশ, প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা, উদ্বৃত্ত-মূল্য, সর্বহারারা একনায়কত্ব, জগৎ পরিবর্তনের উপায়, তত্ত্ব ও চর্চা, পার্টি ও ব্যক্তি, বিপ-বী লড়াইয়ের আবশ্যিক শর্ত ইত্যকার বিষয়ে আলোচনা করলাম। সৈয়দকে দেখলাম এই আলোচনার ফাঁকে তরুণ সমাজের উপর মহাবিরক্ত। এরা দুনিয়াটাকে চেঞ্জ করতে চায় না বুঝলা? এরা চায় শরীর। মেয়ে মানুষের উরুতে হাত রাইখা তিন তিনটা জেনারেশন চইলা গেল। কিছুই হইলো না। সব আফিমে ডুইবা রইলো। শরীরের বাইরে এরা দুনিয়াটাকে দেখলো না। তুইও তাই। বলি, সময় থাকতে শরীরটাকে ছাপায়ে ওঠ। আমি বুঝি, গুরু আমাকে আড়ালে আবডালে নেগেশান অব নেগেশান দিয়া রেবেকার শরীরের দিকেই টানে। কিন্তু আমার নৈতিকতা সায় দেয় না।

একদিন আমি সৈয়দকে বলি অনেক তত্ত্ব তো বুঝলাম। আসো এবার প্রাকটিস শুরু করি। পার্টি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করি।

ভালো কথা। পার্টি কী?

বিপ-বের অগ্রগামী অংশ। শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী একটি পাতিবুর্জোয়া দল। শ্রেণীগতভাবে যারা নিজ শ্রেণীকে খারিজ কইরা আসে।

হইলো না। পার্টি হইলো একটা সম্পর্ক। অসংখ্য মানুষের সম্পর্কের সূত্র হইলো পার্টি। দুইজনে পার্টি হয় না। গঠন করলেই পার্টি হয় না। দুই থেকে তিন– তিন থেকে বহুতে যাইতে হয়। এখন কথা হইলো তুই দুই থেকে তিনে যাইতে রাজি কিনা।

হ রাজি।

তাইলে রেবেকারে রিক্রুট কর। দেখা যাক, আমাদের তিনজনের পার্টি কেমন

জমে?

এ কথায় আমার হাড়গোড়সহ ভেঙে আসে। আমি ভেবেছিলাম আমার প্রসঙ্গে গুরু রেবেকার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু এই কথায় আমি নতুন করে অস্বস্তিতে পড়ে যাই। সে বলে–

তুই আছস কনসেপচ্যুয়ালি পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে– পণ্যতাড়িত অবস্থায়। আমি আছি– আধাসামন্তীয় আধাপুঁজিবাদি অবস্থায়। রেবেকা নারী। অবশ্যই নিপীড়িত গোষ্ঠীর সদস্য। তাকে আমাদের সঙ্গে আনতে হবে। আমাদের তিনজনের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।

আমি কেমনে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাই। মনু বলেছেন, কুত্রাপি গুরুপত্নীর সাথে প্রেম করবা না। এ অবস্থা হলে তো সৈয়দ আমার গুরু থাকে না। সে আমার মার্কসবাদের গুরু। এরপরের এক সপ্তাহ আমি গুরুর সাথে দেখা করিনি। আমার ব্যক্তিগত গুহার মধ্যে আত্মরতিতে মগ্ন হয়েছিলাম। সারা দিন টিভির চ্যানেল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এক সপ্তাহ পার করে দিলাম। হঠাৎ এক সকালে সৈয়দের বাড়ির সামনের চায়ের দোকানদার– আমার বাড়িতে এসে হাজির। কী ঘটনা? সৈয়দ সাহেব ভীষণ অসুস্থ, আপনাকে যেতে বলেছে। সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম সে সত্যি অসুস্থ এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মুখ তার রক্তশূন্য, চোখগুলো কোটরে পৌঁছে গেছে। তার শীর্ণ একটা হাত হাতে নিয়ে মুঠোর মধ্যে ভরে ফেললাম। এতো তাজা লোকটার এই হাল? তবে কি ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে কোনো ভয়াবহ অসুখ ছিল?

গুরু ইশারায় আমাকে তার আরো কাছে সরে যেতে বললো। ফিসফিস করে বললো– যা রেবেকাকে নিয়ে আয়। ওর বাড়িটির চিনতে পারবি? আমি তার কথায় সায় দিয়ে উঠলাম। এতটাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম যে ওখান থেকে যে কোনো মূল্যে উঠতেই চাচ্ছিলাম। পথ চিনে চিনে রেবেকার বাড়ি পৌঁছালাম দুপুরে। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। আমাকে দেখে হাসলেন এবং চিনতে পারলেন। তার মধ্যে অসাধারণ সৌন্দর্যের পাশাপাশি একটা পবিত্রভাব দেখতে পেলাম। সংবাদ শুনে তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বের হলেন।

রিকশায় ওঠার পর তিনি কথা শুরু করলেন।

দুঃখিত, সেদিন আপনার প্রতি সুবিচার করা হয়নি।

আমার একটা প্রশ্ন আছে।

বলুন। এই বলুন উচ্চারণেই তীব্র একটা ব্যক্তিত্বের ছটা টের পেলাম।

নারী হিসেবে এটা কী আপনার জন্য অবমাননাকর নয়?

কোনটা অবৈধ যৌন সম্পর্ক, সৈয়দের সাথে সম্পর্ক নাকি তোমার সামনে যৌনতা?

আমি চুপ থাকলাম।

জেনে রেখ। এটা যৌনতা নয়– এটা একটা যুদ্ধ।

কেমন?

সৈয়দ কি তোমাকে কিছুই বলেনি?

না। আপনার কাছে শুনতে বলেছিল।

শোনোনি কেন এতদিন।

ভয় ছিল।

পাছে জড়িয়ে যাও। সৈয়দ জড়াতে বলেছে, তাই না?

রেবেকো না লতা না বিপাশা তারপর আমাকে সৈয়দের জীবনের গল্পের একটি অংশ বলেছিলেন। তখন রেবেকার সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল একটা ইউজি পার্টি করার দৌলতে। সেভেনটিজের এক বিক্ষুব্ধ সময় ছিল সেটা। হত্যা, বদলা হত্যা, গুমখুন, জেল-জরিমানা। সৈয়দ ছিলেন পার্টির নিচের সারির সদস্য। এদের মৃত্যুর খবরই বা কে রাখে আর জেলেই বা কার কী আসে যায়? আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা অবস্থায় তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং পাক্কা দশবছর পর জেলে থেকে বের হন। আগেই বলেছি, সৈয়দ ছিলেন নিচের সারির অনুলে-খযোগ্য একজন নেতা। ফলে তার এই জেলজীবন কারো নজরে পড়েনি। যেমন অনেক মৃত্যুর কথা কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। তেমনিই ছিল তার গোপন জেলজীবন। তার উপর অবর্ণনীয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়। ফলে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। অধিকাংশ সময় নির্যাতন-ভীতিতে থাকতেন। তিনি যখন জেল থেকে বেরোন তখন আণ্ডারগ্রাউন্ড ওভারগ্রাউন্ড কিছুই খুঁজে পাননি। নিজের শহরে ফিরে দেখেছিলেন, তার জন্যে পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে তার বাবা মরে গেছেন। এরপর রেবেকাকে খুঁজতে থাকেন। রেবেকাকে খুঁজে পান তার শ্বশুর বাড়িতে– তার স্বামীকেও চিনতে পারেন। বলাবাহুল্য সব গল্পের মতোই তার স্বামীটিও ছিল সৈয়দের শত্রুপক্ষের লোক। রেবেকার স্বামীর শহর থেকে রেবেকাকে তিনি নিজ শহরে নিয়ে আসেন তার আরও পাঁচ বছর পর, যখন তার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। তাকে এনে রাখেন নিজের পুরানা পৈত্রিক বাড়িতে।

শোনো ও যখন যৌন সম্পর্ক করে তখন নিজের জীবনের ব্যর্থতা, আমার মৃত স্বামীর প্রতি ক্ষোভ, এই ব্যবস্থা– সকল কিছুর বিরুদ্ধে তার শারীরিক প্রতিবাদ জানায়। আই এনজয় ইট।

এতকিছু জানার পর আর সৈয়দের সামনে যাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা, অবসাদ ও বেদনায় আমি নুয়ে পড়ি। তার এই সংগ্রামমুখরতার সামনে নিজেকে অনেক ক্ষুদ্র মনে হয়। রেবেকাকে পৌঁছে দিয়ে আমি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ওষুধ কিনতে বাজারে যাই। রেবেকা তার দায়িত্ব নিলে কিছুটা ভারহীন বোধ করি। ডাক্তার এসে দেখে যায়। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে একের পর এক সিগারেট ফুঁকতে থাকি। মানুষের জীবন, জীবন-অভিজ্ঞতা, উত্থান, পতন, গোপন বেদনা আমাকে জীবন সম্পর্কে এমন একটি আবিষ্কারের মুখোমুখি দাঁড় করায় যাকে স্বচক্ষে দেখতে গেলেও আমি ভয় পেতে থাকি। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে থাকে। দুই কি একদিন এভাবেই গেল। তৃতীয় দিনে একটু স্বাভাবিক হয়ে এলাম। সৈয়দের বাড়িতে

চলাফেরায় স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলাম আবার। এমনকি তার সামনে যেতেও। দেখলাম মৃত্যু তার দিকে ঘনিয়ে আসছে। গালের দু'পাশ বেয়ে সাদা কষ পড়ছে। পুরাতন নির্যাতনের বেদনা ফিরে আসছে তার শরীরে। তাকে আরও গরম কাপড়ে ঢেকে দেয়া হলো। আমি আর রেবেকা সারারাত শিয়রে বসে থাকলাম। তার কপালের রেখাগুলো দপদপ করছিল আর চোখ থেকে পানি ঝরে বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছিলো। বিকেলের দিকে শ্বাসকষ্ট আর কাশির গমক উঠতে শুরু করলো। ওই সন্ধ্যায় বিপাশা আমাকে সৈয়দের অদ্ভূত অনুজ্ঞার কথা শোনালেন রিডিংরুমে ডেকে নিয়ে। বললেন, সে চায় তুমি আমাকে তার সামনে চুমু খাও। হি লস্ট এভরিথিং বাট মি। সে দেখে যেতে চায় তার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার জন্য আছ। হি হ্যাজ সিলেকটেড ইউ ফর মি।

আমি চুপ করে থাকলাম। বিপাশাও। অনেক পরে বললো, অনেস্টলি বললে সৈয়দের পরে আমি তোমাকে ভালোবাসি। ওর কাছে তোমার পুরোটা শুনেছি। অবশ্য একান্তই যদি তুমি না চাও। যদি কোনো অনুভূতিই না জাগে তোমার। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আমি বললাম, একটু বসুন। আমি তার শরীরের দিকে তাকালাম। সেদিনের ঘটনাটি নিমেষে চোখের সম্মুখ দিয়ে ভেসে গেল। কী অবাক, তার সেদিনের সেই যৌনকাতরতা এই প্রথম আমার সংবেদনে এসে ঘা মারলো। তার স্তনের কথা মনে পড়লো। অনুভব করলাম হয়তো আমি তাকে ভালো বাসতেও পারি। আমি তার চুল মুঠো করে ধরে এক পলকা একটা চুমো খেয়ে বসলাম। ওইটুকুতেই তার শারীরিক সম্মতি টের পেলাম।

রেবেকা না লতা না বিপাশা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সৈয়দের বিছানার কাছে গিয়ে হয়তো বললো, হ্যাঁ যে রাজি হয়েছে। এবার তুমি নিশ্চিন্তে মরতে পারো। তারপর আমাকে ডাকতে এলো। হাত ধরে টেনে নিয়ে সৈয়দের বিছানার কাছে দাঁড় করলো। সৈয়দ চোখ মেলে দেখলো– আমরা পরস্পর চুমু খাচ্ছি। খুব গাঢ়, অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে। সে জানলো এই প্রথম। তাঁর খুশির জন্যই। কিন্তু, এ দ্বিতীয়বারের ঘটনা। শরীর এভাবেই দূরে সরে যায়। অবশ্য খুব বেশি দূর যেতে পারে কি? তার কষ্ট দেখেই কিনা জানি না আমি ও রেবেকা না বিপাশা না লতা তার আশু মৃত্যু কামনা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হলো। খুবই কষ্টকর এবং বেদনাদায়ক এক মৃত্যু। আমাদের গোপন পার্টির একজন কমরেডের প্রস্থানে আমরা শোকাহত হলাম।

নদীর জল মচকা ফুলের মতো লাল

১৯৮৮ কি ৯৮ কি ২০০৩ সালের নভেম্বরে আমরা শহরের প্রান্তে এসে দাঁড়াই, এই স্থান থেকে দেখলে নদীটি সবচেয়ে নিচুতে দেখা যায় কেননা শহর রক্ষা বাঁধ এখানে অত্যধিক উঁচু করে বাঁধা। আমরা নিজেদের কাছেই আনমনে জিজ্ঞেস করি বাঁধ যে অনেক উঁচু করে তৈরি হলো তার কারণ কী। তখন আমাদের পাশ্ববর্তী এক লোক যে আমাদের সঙ্গীও হতে পারে সে বলে যে এইটাই নিয়ম, শহরের এক স্থানে নদীর ধারে বাঁধ খুব উঁচু থাকে, এইটাই বাঁধ তৈরির নিয়ম। যে কর্তৃপক্ষ বাঁধ তৈরি করে তারা নাকি চায়– লোকে উঁচু থেকে নদী দেখুক, চাইলে গড়িয়ে পড়ুক। শহরে আত্মহত্যার একটা বন্দোবস্ত থাকা দরকার। এই উঁচু জায়গাটা হলো লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করার একটা সরকারী ব্যবস্থা। এসব কথা শুনে আমরা ভয়ে ভয়ে বাঁধের ধারে পা ছাড়িয়ে বসে পড়ি। এবড়ো-খেবড়োভাবে বসানো অসংখ্য পাথরের অনেক নিচে খাড়া নেমে গেছে নদীর তীর। তারপর নদী। এতদূর থেকে আমরা নদী দেখতে পাইনা। আমাদের একজন বলে এই বাঁধটাই নাকি নদী। একদিন এই নদীটা শুকিয়ে গেলে নাকি লোকে বিকেলের হাওয়া খেতে এসে বাঁধটাকে নদী ঠাওরে সুখ পাবে। আমরা বলি তা কী করে হয়?

সে লোক বলে, কেন বর্ষায় কি এই বাঁধ উপচে পড়ার জোগাড় হয় না?

তার মানে তো যতোটুকু জল ততোটুকুই নদী। তবে তো একেক মৌসুমে নদী একেকটা। এইসব ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বাঁধের মৃত্যুময়তায় কথা আমাদের আবার স্মরণ হয়। আমাদের আবার স্মরণ হয় আত্মহত্যার কথা। আমরা আত্মহত্যাপ্রবণ লোকগুলোর অদৃষ্টচক্রের কথা ভাবি। তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি মনে মনে। তখন আমাদের একজন হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে থাকে। এ ধরনের কান্না ভাল নয়। যারা অযথা কাঁদে তারা নিজের ভয়াবহ দুঃখের দিনে কাঁদতে পারে না। অক্ষিকোটর চিনচিন করে ব্যথা করলেও কাঁদবার মতো সামান্যজলও তাদের চোখে থাকে না। আমরা সঙ্গীটিকে পরমর্শ দেই সে যেন তার চরম দুঃখের সময়গুলোকে স্মরণ করে এবং ভবিষৎ দুঃখের কথা মাথায় রেখে আর না কাঁদে। এ কথা শোনার পর তার কান্না আরও বেড়ে যায়। সে পুরো শরীর ঝাঁকিয়ে কাঁপতে

কাঁপতে কাঁদে। তখন আমরা তাকে জড়িয়ে ধরি। সে মিনমিনে কণ্ঠে কী যেন বলতে থাকে, তার সেই অস্ফুট বিলাপে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হই। আমরা তার বিলাপের অর্থভেদ করতে পারিনা। উৎকণ্ঠায়, অবসন্নতায় কান খাড়া করে তার বিলাপ শুনতে চেষ্টা করি। সে একবার বলে ওঠে আমার ভাইরে, আমার ভাইরে। তখন আমাদের স্মরণ হয় তার ছোট ভাই জয়নাল আবেদিনের কথা। আমরা জয়নাল আবেদিনের কথা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে উঠি। আমাদের মনে পড়ে জয়নাল আবেদিনকে শেষবার শহরের রাস্তা ধরে এই বাঁধের দিকেই ছুটে আসতে দেখেছিলাম। জয়নাল আবেদিন কেন একজন মৃত মানুষের মতো দৌড়াচ্ছে এই কৌতুহল থেকে রাস্তায় নেমে আমরা দেখতে পাই নীল পোশাক পরা একদল পুলিশ ভারি বন্দুক হাতে তার পিছনে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তার লোকদের আমরা জিজ্ঞেস করলে তার বলে– তারা কিছুই জানে না। তবে এ দৃশ্য তো নতুন নয়, পুলিশ তরুণদের পিছনে ছুটে বেড়ায় তাদের দৌড়াবার ক্ষমতা পরখ করার জন্য। এই দৌড়াবার সময় তারা অযথাই হুইসেল দেয়, বুটের শব্দ করে আর রাইফেলে খটাখট আওয়াজ তোলে যাতে সকলে ভাবে তাদেরকে এই মুহূর্তে প্রশ্ন করা ঠিক নয় যে, তারা একজন যুবক জয়নাল আবেদিন, রুবেল, হানিফ কি আক্কাসের পিছনে কেন দৌড়ায়। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে জয়নাল আবেদিনকে বাঁধের দিকে দৌড়াতে দেখি আর তার দৌড়াবার ক্ষমতাকে প্রশংসা করি। রাস্তায় একদল লোক পুলিশের পক্ষ নেয়। তারা বলে, পুলিশের সাথে পেরে উঠবার মূল কারণই হলো সে হালকা-পলকা আর তার হাত খালি পুলিশের মতো এরকম একটি বন্দুক হাতে নিয়ে দৌড়ালে নিশ্চিত সে পুলিশের পেছনে পড়ে থাকতো। এরপর আমরা সমবেত জনতার সাথে সাথে ধীরে, কাম্পিত পদক্ষেপে বাঁধের দিকে যাই। দেখি যে, পুলিশগুলো বর্ষার ভরাট নদীর ধারে ফ্যাল-ফ্যাল চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু, আমরা কোথাও জয়নাল আবেদিনকে দেখতে পাইনা। জয়নালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আমরা ভাবি, সে সম্ভবত পুলিশগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। পুলিশগুলো বিষণ্ন মুখে থানায় ফিরে যায়। পরদিন কি তার পরদিন তুরাগ কি বংশাই কি বুড়িগঙ্গায় জয়নাল আবেদিন ভেসে ওঠে। আরেক শহরের পুলিশভ্যানে চড়ে জয়নাল আবেদিন এই শহরে আসে। আমরা সকলে জয়নালকে দেখতে যাই। দেখি যে, জয়নালের মা রাস্তায় ধুলোয় ফিট হয়ে পড়ে আছে। আর জয়নাল ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে একটা চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছে। আমাদের আরও মনে পড়ে পরদিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে জয়নালের ছবি ছাপা হয়। তারা আমাদের জানায় জয়নাল নদীতে লাফিয়ে পড়বার আগে তিনদিন পুলিশ হাজতে ছিল। তার অপরাধ ছিল যে, সে এই বাঁধের ধারে রাত-বিরাতে হাঁটতে বেরিয়েছিল এবং দেখতে পেয়েছিল যে, কয়েকজন পুলিশ একটি মেয়ের লাশ নদীতে ফেলে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখবার পর জয়নাল পালাতে থাকে, পালাতে পালাতে সে একটা পোড়ো ঘরে আশ্রয় নেয় এবং দেখে যে ওই পোড়ো ঘরটি আসলে তার লুকোবার জায়গা নয়, সেটি থানা। থানা হাজতে পুলিশ তাকে আটকে রাখে।

তিনদিন যাবার পর যখন, জয়নালের পিতা-মাতা তাকে খুঁজতে থাকে তখন পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয় এবং বলে যে দৌড়া-দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারলে তোর মুক্তি। জয়নাল দৌড়াতে থাকলে পুলিশ বলে এক ছিনতাইকারী পালাচ্ছে। তখন তারা সমস্ত শহর জুড়ে জয়নালের পিছনে ছুটতে থাকে। এ সমস্ত কথা স্মরণ হলে আমরাও অকালপ্রয়াত লিকলিকে জয়নালের জন্য শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। তার শোকাচ্ছন্ন ভাইকে বলি, এ কথা ভেবে কী লাভ? এমনও তো হতে পারতো যে, জয়নালের লাশও আর পাওয়া গেল না? কেননা নদীর উজান থেকে কত লাশ যে এসে পড়ে আমাদের নদীতে তার হিসেব কি কেউ রাখে? একবার আমরা বাঁধের উপরে শকুনের ঝাঁক উড়তে দেখতে পাই। তখন আমাদের মনে পড়ে বহুদিন আমাদের শহরে গরু মরে না। আমরা ভাবি যে, বাঁধের কাছাকাছি কোথাও হয়তো গরু মারা পড়েছে। এই মরা গরু এবং গরুটিকে ঘিরে শকুনের ওড়াওড়ি দেখতে আমরা বাঁধের কাছে যাই। দেখি যে বাঁধে কিছু নেই। কিন্তু একইভাবে আরও অসংখ্য মানুষ বাঁধে এসেছে একই দৃশ্য দেখতে। সমবেত মানুষের দৃষ্টি অনুসরণ করে অপর তীরের দিকে তাকালে দেখতে পাই, হাজার হাজার শকুন নদীর অন্যতীর কালো করে ফেলেছে। শকুনের ভয়ে কেউ কাছে ভিড়তে সাহস পায় না। নদীতে যাতায়াতরত নৌকার লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, এগুলো মানুষের লাশ। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করি এই লাশ কোত্থেকে আসে– তারা বলে তারা জানে না, তবে নদীতে আরও অনেক লাশ ভাসছে। তারা দ্রুত নৌকার লগি ঠেলে চলে যায়। তখন সমবেত লোকদের একজন বলে, তার মনে হয়, মেঘনায় লঞ্চ ডুবি হয়েছে- সেখান থেকে লাশ ভেসে আসছে। অন্যরা বলে উজানে ভাটির লাশ আসে কী করে? আরেকজন বলে, সম্ভবত ইন্ডিয়ায় দাঙ্গা লাগছে, এই লাশ শবরমতি নদীর। আমরা বলি, সে কী করে হয় শবরমতি তো অনেক দূর। আরেকজন বলে, কেমনে কই বাপু, সব নদীই তো কোনওনা কোনও জায়গায় সব নদীর সাথে এক হয়ে আছে। আমরা চোখের উপর হাত তুলে দূরের লাশগুলো দেখতে চেষ্টা করি– সেগুলো ইন্ডিয়ার না বাংলাদেশের, শবরমতির না বুড়িগঙ্গার, হিন্দু না মুসলমানের, নারী না পুরুষ, বন্দুকের গুলিতে না ধর্ষণে নিহত কিছুই বোঝা যায় না। তখন হঠাৎ পুলিশ আসে, তারা বলে এই ভাবে লাশ নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না। লাশের রাজনীতি যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে। লাশ দেখার অপরাধে তারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাস ছোড়ে, এবং হেডকোয়ার্টারে ওয়ার্লেস করে আরও পুলিশ ও জল কামান পাঠাবার জন্য। তারা শান্ত জনতাকে আরও শান্ত হতে বলে। আইন লঙ্ঘনের ঘটনা না ঘটলেও তারা বলে, আপনারা আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না। যারা লাশের রাজনীতি করতে চায় তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকুন। পরদিন পুরো শহর সরকারি লোক, টিকটিকি, রাজনীতিক আর ফটোগ্রাফারে ভরে যায়। আমাদের মনে পড়ে, শহরে ১৪৪ ধারা জারি হয় এবং নাগরিকদের ৭২ ঘন্টা ঘরে আটকে রাখা হয়। এবং ৭২ ঘন্টা পর যখন সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন মানুষ ভুলে যায় অতীতের ঘটনা তারা– মনিকা

লিউনস্কি, কি প্রিন্সেস ডায়ানা কি জেসিকা লিঞ্চ কি আর্নল্ড শোয়ার্জনিগার নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। আমাদের মনে পড়ে শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই শান্ত হয় এবং পুলিশের প্রতি আস্থা এতই বেড়ে যায় যে শহরের এক তরুণী এক পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রেমপত্র দেয়। এরকম একটি সময়ে আমরা নদীতে একটি নৌকা ভেসে আসতে দেখি। নৌকায় একজন লোক উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে স্রোতের গতিবিধি লক্ষ করে। ক্রমান্বয়ে তিনদিন আমরা একই নৌকা এবং লোকটিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাই। তখন আমরা জিজ্ঞেস করি কী ঘটনা। লোকটি কোনো কথা বলে না। নৌকার মাঝি বলে যে, তিনি তার পুত্রের লাশের সন্ধানে বেরিয়েছেন। জানা গেছে তার পুত্রের লাশ ৩৬ খণ্ড করে এই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এ পর্যন্ত ১৩ খণ্ড উদ্ধার করা হয়েছে। ২০ খণ্ড পেলেই ছেলের দাফন করা হবে। আমরা শহরের কাউকে এ খবর বলি না। কিন্তু শহরে বেশ কানাঘুষা হয়। আমরা বুঝতে পারি শহরের সকলেই এই উৎকণ্ঠিত বাবার নৌকাভ্রমণ– দেখতে পেয়েছে এবং সকলেই জানে ১৩ খণ্ড লাশের বেশি এখনও উদ্ধার করা যায়নি। কেউ এই ঘটনা থানায় জানায় না। আমাদের মনে পড়ে না থানা এই কথা জানতে পেরেছিল কিনা। তবে আমাদের মনে পড়ে এসময় শহরের শীর্ষ সন্ত্রাসীর পায়ে গুলি করে পুলিশ তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। দৈনিক পত্রিকাগুলো এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপে এবং এই কৃতিত্বের জন্য পুলিশ কর্মকর্তা সোনার মেডেল পায়। কেউ কেউ বলে যে এই মেডেল তারা ঐ তরুণীর গলায় ঝুলতে দেখেছিল যে নাকি পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রেমপত্র লিখেছিল। এই তরুণীর সাথে পুলিশ অফিসারের প্রেমপর্ব আমরা ভুলতে বসলাম যখন জানতে পারলাম, শহরে এমনকি গ্রামে গ্রামে মাছ চাষ নিষিদ্ধ হচ্ছে। এরকম কথাও নাকি হচ্ছে যে মৎস্য অধিদপ্তর বিলুপ্ত ঘোষণা করা হবে। এই ঘোষণার পর শহরে মাছের দাম বেড়ে যায়। মাছের দাম বেড়ে গেলে মানুষ বেশি বেশি করে মাংস কিনতে থাকে। ফলে মাংসের দামও বেড়ে যায়, মাংস রান্না করতে বেশি পেঁয়াজ লাগে বলে একসময় পেঁয়াজের দামও বেড়ে যায়। কিন্তু চিনির দাম বেড়ে গেলে আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। আমরা বুঝতে পারি না, চিনির সাথে মাছ চাষ নিষিদ্ধ করার সম্পর্ক কী। গ্রাম থেকে খবর আসে যে পুলিশ, বিডিআর আর আর্মি গ্রামের সব পুকুর ঘিরে ফেলেছে। তারা গ্রামবাসীকে নিজ নিজ পুকুর সেচে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, এইসব পুকুর থেকে দৈনিক গড়ে ৬০ হাজার রাউন্ড গুলি উৎপাদিত হয়। আমরা অনুমান করি, বিদেশী জাতের মাছ চাষ করার ফলেই এ ধরনের গুলি উৎপাদিত হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট করে জানতে পারি না ঠিক কোন জাতের মাছ গুলি প্রসব করে। গ্রামের লোকেরা আন্দোলনে নামে। তারা মাছ চাষের হুমকি সরিয়ে নিতে অনুরোধ করে এবং সরকার এদের উপর লাঠিচার্জ করে আন্দোলন দমন করে। এই ফাঁকে আরও দু'দফা পেঁয়াজের দাম বাড়ে। একদিন আমরা এও জানতে পাই যে, ষড়যন্ত্রকারীরা পেঁয়াজের ট্রাকে অস্ত্র পাঠিয়ে আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটায়। ফলে, সকল

পেঁয়াজের গাড়ি আটক করে অস্ত্র পরীক্ষা করা হয়। এর ফলে হঠাৎ মরিচের দাম বেড়ে যায়। ব্যবসায়ীরা বলে যে, মরিচের দাম বাড়ানো ছাড়া অস্ত্র আমদানী রোধ করার কোনও উপায় নাই। এরকম একটি দিনে হঠাৎ পুলিশের প্রেমে পড়া মেয়েটি আত্মহত্যা করে। পত্রিকায় মেয়েটির স্যুইসাইড নোট ছাপা হলে আমরা জানতে পারি যে, মেয়েটি আসলে অভিমানী, হঠাৎ সে অন্তঃসত্তা হয়ে পড়লে পুলিশ তাকে পেঁয়াজের দাম কমার পর বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি যখন বুঝতে পারে পেঁয়াজের দাম কোনও দিনই কমবে না তখন আত্মহত্যা করে তার করুণ প্রেমের ইতি টানে। এ ঘটনার পর শহরে তিনটি মানববন্ধন হয়, দৈনিক পত্রিকায় ১০৮ টি সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং ২৩৩ জন নারী নেত্রী ঘটনার প্রতিবাদে একঘণ্টা রোদের মধ্যে শহীদ মিনারে সমবেত হন। আমরা বলি যে, মেয়েটির হাতের লেখা ভাল। মেয়েরা যে খুব বেশি ঘরের বাইরে বেরোতে পারে নি তা আমরা ওই মেয়েটির ঘরের মধ্যে আত্মহত্যার খবরে নিশ্চিত হই। শহরে সে-ই প্রথম যে বাঁধ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেনি। বলাবাহুল্য, সে দড়ির সাহায্যে ফ্যানের সাথে ঝুলে আত্মহত্যা করে। সরকারের পক্ষ থেকে দড়ি উৎপাদন বন্ধে কার্যকর বাবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হলে আমরা জানতে পারি, পুলিশ, বিডিআর মিলে পাটকল ঘেড়াও করে দড়ি উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। এ কারণে আমরা উল-সিত হই। এবং বুঝতে পারি, স্যুইসাইড নোটের কাগজ সরবরাহের অপরাধে অচিরেই কাগজকলগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। আমাদের ক্রন্দনরত বন্ধুর ভাই হারানোর বেদনা আমাদেরকে মর্মাহত করে। আমরা তাকে বাঁধের ধার থেকে সরিয়ে শহরে ফিরিয়ে আনি। শহরে ফিরবার পর সঙ্গীটি জিজ্ঞেস করে রান কত হয়েছে ? আমরা তার এই স্বাভাবিক কৌতুহলে স্বস্তি বোধ করি। আমরা দেখি যে, শোরুমের সামনে ৩০/৪০ জন লোক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ক্রিকেট খেলা দেখছে। বাংলাদেশ বনাম ইংল্যান্ড। তাদেরকে জিজ্ঞেস করে আমরা সঙ্গীকে রান এবং উইকেট সংখ্যা জানাই। বন্ধুটি তখন নতুন কোচের প্রশংসা করে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা আরেকটি শোরুমের কাছে পৌছাই। রান জিজ্ঞেস করি। রান শুনে আবার হাঁটতে থাকি। এভাবে আবার আরেকটি শোরুমের সামনে দাঁড়িয়ে রান জিজ্ঞেস করলে লোকজন আমাদেরকে টেলিভিশনের দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করে। আমরা দেখি- টেলিভিশনের মধ্য থেকে ক্রিকেট মাঠ হাওয়া হয়ে গেছে । একটি ব-াকহক হেলিকপ্টার আকাশ থেকে ক্রমান্বয়ে ভূপাতিত হচ্ছে। আমরা জানতে চাই কতজন মরলো, লোকজন সংখ্যা বললে আমরা আবার হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে আবার নদীর ধারে পৌছাই, এ সময় কী হয় জানি না, আমাদের খুব ইচ্ছা হয় নদীর জল ছুঁয়ে দেখতে। আমরা নদীর দিকে নেমে যেতে থাকি। লক্ষ করি, আকাশ লাল মেঘে ভরে গেছে। এও লক্ষ করি, নদীতে ওই মেঘের প্রতিফলন নদীর জলকেও লাল করে দিয়েছে। তখন আমাদের এক বন্ধু বলে, এখানে নদীর জল মচকা ফুলের মতো লাল। আমরা বুঝতে পারি না এটা জীবানানন্দের লাইন কিনা। তবে এরকম সময়ে নদীর তীর আমাদের দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। আমরা

গভীরভাবে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করি। তখন আমাদের এক সঙ্গী ভয়ার্ত চিৎকার করে ওঠে। হঠাৎ আমাদের শ্বাস ভারি হয়ে আসে। তার কাছে এগিয়ে গেলে আমরা দেখি তার পায়ে রক্ত। সে বলে, নদীতে তো পানি নাই, শুধু রক্ত। আয়েশ করে পা ডোবাতে গিয়ে সে লক্ষ করে যে তার পা ক্রমশ আঠালো হয়ে আসছে, তৎক্ষণাৎ পা সরিয়ে আনলে সে দেখে তার পায়ে রক্ত জমে আছে। আমরা বলি, তা কী করে হয় নদীতে এত রক্ত আসবে কোত্থেকে? এ নিশ্চয়ই ডাইং-এর পানি। এ কথা বলে ফেলে আমরা বাতাসের গন্ধ শুকতে গেলে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। বাতাসে রক্তের লবণাক্ত স্বাদ অনুভব করি। ভয়ার্ত চোখ নিয়ে আমরা ছুটতে শুরু করি। ছুটতে ছুটতে অনেক দূর চলে গেলেও নদীর কাছ থেকে দূরে, লোকালয়ে সরে যেতে পারি না। নদীর কিনার ঘেঁষে একটি ডাইং এর নালার কাছে পৌঁছালে আমরা দেখি নালাটি শুকানো। তখন আমাদের মনে পড়ে আজ তিন দিন কারখানা বন্ধ। ডাইং-গার্মেন্টস সব বন্ধ। এ কথা মনে হওয়ার পর আমাদের দেহ অসাড় হয়ে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে আবার দৌড়াতে থাকি আমরা। একটি গার্মেন্টসের ড্রেন বেয়ে রক্তের ধারা তখনও নদীর পানির সাথে মিশে যাচ্ছে। তাজা রক্তের ধারার সাথে টিয়ার গ্যাস, গুলির গন্ধ, ঘাম, চিৎকার সব একাকার হতে থাকে। পালাতে থাকি আমরা। উল্টোপথে দৌড় দেই। এই অস্বাস্থ্যকর, বিষাক্ত, রক্তনদীর থেকে অনেক দূরে পালাতে হবে আমাদের।

উপেন সরকার ও তার তিন কন্যা

আমাদের লেখক বন্ধু আহমেদ ফারুক যদি উপেন সরকার ও তার তিন কন্যা বিষয়ক গল্পটি লিখতেন, তবে সেটি হতো সবচেয়ে ভালো। কেননা এই তিন কন্যাকে তার চেয়ে ভালো করে আর কে চেনে। বিশেষত এ সংক্রান্ত সকল ঘটনাও যেহেতু তার কাছ থেকেই শোনা। অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, নিজে না লিখে গল্পের উপাদন অন্যকে সরবরাহ করার রীতিটিও আমাদের এখনে সুপ্রচলিত। গল্পটি বলবার পূর্বে তিনটি সম্পর্ক স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন, তাহলে আহমেদ ফারুক না লিখে আমি কেন গল্পটি লিখছি সেটি স্পষ্ট করা যাবে। ১. আহমেদ ফারুকের সাথে আমার সম্পর্ক; ২. আহমেদ ফারুকের সাথে উপেন সরকার ও তার তিন কন্যার সম্পর্ক; ৩. উপেন সরকারের সাথে তার তিন কন্যার সম্পর্ক।

শেষোক্ত সম্পর্ক দিয়েও শুরু করা যায়। তারও আগে উপেন সরকারের নিবাসস্থল, বিরামপুর সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। বিরামপুরে একটি রেলস্টেশন আছে। একটি আন্তঃজেলা সংযোগ সড়কও বিরামপুরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। সম্ভবত, রেলগাড়ির বিরতিদানকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের নাম বিরামপুর হয়েছে। বিরাম অর্থ বিশ্রাম। এখানে একটি পতিতালয়ও আছে। স্টেশন থেকে পতিতালয়টি দৃশ্যমান। মাঝে শুধু কালিগঙ্গা নদীর ভেদ। এহেন বিরামপুরে আহমেদ ফারুকের যাতায়াতের বিষয়টি একটি সহজাত প্রশ্নের জন্ম দিতেই পারে। বিশেষত যখন তার নিবাস বিরামপুরে নয়। এ প্রশ্নটি জমা রইলো। এখন বরং রেলস্টেশন, রেলগাড়ি ও রেললাইনের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বলি। বিরামপুরের মানুষের যৌথ সময়ের ধারণার সাথে রেলগাড়ির যাতায়াতের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। বহু লোকের সময়ের ধারণা রেলগাড়িকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই কালে ঘড়ির ব্যবহার নিয়ে উচ্চবাচ্য করা বোকামি, তবু সময়ের যৌথ ধারণা বলে একটা কথা আছে। রেলগাড়ির নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে কোনোদিনই যাতায়াত করে না ফলে, সময়ের সাথে রেলগাড়ি যোগাযোগকে এই অঞ্চলের মানুষের ধীরগতির নির্দেশকও বলা চলে। বছরের প্রতিটি দিন বিরামপুর হতে নারী-পুরুষ ভরা লোকাল গাড়িটি জেলা শহরে যায়। তারা সেখানে নানান কর্ম করে আবার সন্ধ্যার লোকালে ফিরে আসে। সীমান্তবর্তী স্টেশন বলে চোরাচালানের জন্যও ট্রেনে করেই লোকজন সীমান্ত বর্তী স্থান পর্যন্ত যাতায়াত করে। চোরাচালানের সাথে বিরামপুরের বহু নারী-পুরুষ জড়িত, তারা অবশ্য একে চোরাচালান হিসেবে দেখে না। এটি বরং তাদের কাছে এক প্রকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়। বড় ধরনের চোরাচালানকারীরাও এই স্টেশনটিকে বিশেষ

পছন্দ করে। বলাবাহুল্য, আন্তঃনগর ট্রেনগুলি এখানে দাঁড়ায় না। এবং এগুলি এই স্টেশন মোটামুটি একটা সঠিক সময়েই অতিক্রম করে। এই স্টেশন অতিক্রম করবার সময় আন্তঃনগর ট্রেনগুলি একটু অতিরিক্ত বেগেই ছোটে। তবু স্টেশনের সাথে এলাকার লোকের যোগ অসামান্য। স্টেশন থেকে খানিক দূরে উপেন্দ্রনাথ সরকারের বাস। মোটামুটি ৫০০ গজ রেলপথ অতিক্রম করলে– উপেন সরকারের বাড়ি, স্টেশন, পতিতাপল-ী ও কালিগঙ্গা নদী এক স্থান থেকেই দেখা যায়। সবচেয়ে নিকটে পড়ে সরকার মশায়ের বাড়িটাই। কিছুকাল আগেও সরকার মশায়ের তিন কন্যা বিকাল সময়টা রেললাইনের উপর কাটাত। একটি ঘটনার পর আর আসে না। সেই ঘটনাটি পরে বলা যাবে। কে না জানে, রেলপথগুলোতে লজ্জাবতী লতা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। লজ্জাবতী লতার সংবেদনশীলতার কথাও কারও অজানা নয়। স্পর্শ পেলেই এর পাতাগুলো বুঁজে যায়। খানিক পরে আবার পাতা খুলেও যায়। তিন কন্যার বিকাল কাটাবার প্রধান অবলম্বন ছিল লজ্জাবতী লতার পাতা স্পর্শ করার খেলা। এই খেলায় তারা বিশেষ পারদর্শী ছিল। তারা সন্তর্পণে গাছের নিকটে গিয়ে একটি একটি করে পাতা বুঁজতো– যাতে অন্যান্য পাতাগুলো টের পেয়ে আগেই বন্ধ হয়ে না যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই খেলা চলতো। সন্ধ্যায় লজ্জাবতী পাতা নিজেই বুঁজে আসে। এই তিন কন্যার কল্যাণে পাতাগুলো আগেভাগেই ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হতো, সন্ধ্যার আগে আগে আবার চক্ষু মেলবার অবকাশ পেতো না। উপেন সরকারের মেয়েদের বয়সের তুলনায় এই খেলাটিকে অনুপযুক্ত বলা চলে। তবু বিকাল হলেই তারা খেলাটি আবশ্যিকভাবে খেলতো। এখন এই তিন কন্যার বয়স বিষয়ে কিছু বলা যাক। প্রথম কন্যা সঞ্চিতা বিরামপুর কলেজ থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছিল। লাবণ্য ইন্টারমেডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে এবং মাধবী এই বছর এস.এস.সি দিতো। এদের মধ্যে লাবণ্যই কনিষ্ঠ কিন্তু মাধবী ছাত্রী ভালো না বলে পড়াশোনায় লাবণ্যই অগ্রসর ছিল। এদের মা জীবিত কি-না এ বিষয়ে আহমেদ ফারুক কিছু বলতে পারেন না। এ বিষয়ে তিনি এমন একটি ঘটনার উলে-খ করেন যাতে তিনি এদের মার দেখা পেতে পারতেন, কিন্তু পান নাই। সেটি হলো একবার ঘোর বর্ষার বৃষ্টির পানি মাথায় করে তিনি উপেন সরকারের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কালিগঙ্গায় পানি থৈ থৈ। সঞ্চিতাদের উঠানেও পানি ওঠে ওঠে। বৃষ্টির মধ্যে তিনি কাকে ডাকবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ডাকলেও শুনতো কি-না সন্দেহ। তাই তিনি সোজা ভেতরে ঢুকে পড়েন। তিন কন্যা একটি ঘরেই ছিল। সঞ্চিতাই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। অন্যেরা তার উপস্থিতিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেনি। সঞ্চিতা বলেছিল, বাবা তো নাই। ঐ অবস্থায় তাকে বসতে দেবার কথা নয় কি? বিশেষত বাইরে যখন প্রবল বৃষ্টি। উপেন সরকার এই সময় হয়তো নৈমিত্তিক আড্ডায় দাবা খেলছিলেন। কখন ফিরবেন তার তো কোনো ঠিক নেই। তখন, আহমেদ ফারুক নাকি বলেছিলেন, আমি তো আপনার কাছেই এসেছি। সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে হাসির রোল উঠেছিল। তাতে তিন মেয়েই অংশগ্রহণ করেছিল। আহমেদ ফারুক যে রকম লোক তাতে একথা ভাবা ঠিক হবে না যে, তিনি কিছু না ভেবেই একথা বলে বসবার জন্য একটি অবকাশ তৈরি করতে

চেয়েছিলেন। বরং, গল্পকারসুলভ নিরীক্ষাপ্রবণতা সকলই তার মধ্যে ছিল। একথা তিনি বলেছিলেন স্রেফ সঞ্চিতা কী করে তা দেখার জন্যই হয়তো। বলতে হবে, সঞ্চিতা ও তার দুই বোনের প্রতিক্রিয়া ছিল অভিনব। বিশেষত বাইরে তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো। সেই বৃষ্টির মধ্যেই আহমেদ ফারুক বাজারে ফিরে এসেছিলেন। এবং বাড়ি হতে রেললাইনে ওঠা পর্যন্ত রাস্তাটুকুতে সর্বদাই কান খাড়া করে রেখেছিলেন। যদি পিছন থেকে ডাক আসে। মানবতা বলেও তো কিছু আছে। রেললাইনে উঠবার পর এই বৃষ্টিজলের দিনে একাকী বাড়িটির দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়েছিল এই পথেই উপেন সরকারের তিন মেয়ে নিরুদ্দেশ হবে।

এখন উপেন সরকারের কথা। অবসর গ্রহণের পরও উপেন সরকার বহুবার পুরনো স্কুলের বারান্দায় অভ্যাসবশে হাঁটাহাঁটি করতে গিয়েছেন। যখনই মনে পড়েছে, বুঝে ফেলেছেন এই ভ্রান্তি, বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীরা যখন করুণার চোখে তার দিকে তাকিয়েছে, তখন একটি কথাই বারবার নিজেকে বলেছেন, অনেক তো হলো উপেন, মেয়েরাও বড় হলো। কিন্তু তার ভাগ্যে আরো কিছু হওয়ার বাকি ছিল। তার চাঞ্চল্য বয়স্যরা তাকে উপলক্ষ করেই দাবার আয়োজন করলেন। দেশ-দশের জন্য তো অনেক করলে, এবার এসো তবে। তখন নেহাৎ খেলার সময় নয়। তবু উপেন এই খেলাতেই জড়িয়ে পড়লেন। সকাল নাই, বিকাল নাই, দুপুর নাই, বৃষ্টি নাই, বাদলা নাই। বোধহয় এইবার ঘাট বেঁধে নামলেন। মেয়েরা প্রথমে উপেনের এই অবকাশে খুশি হয়েছিল। বাবা তাহলে সময় কাটাবার জন্য কিছু পেলো। বাপকে তারা ভালোবাসতোই। তারাও ব্যস্তও হয়ে পড়েছিল বাপকে এবার কী কাজ দেবে এই ভেবে। আহমেদ ফারুক উপেন সরকারের কাহিনী বলবার সময় গল্পের নানা পর্যায়ে অন্তত চারবার এই কথাগুলোর উলে-খ করেছিলেন। যেন সব কিছুর মূলে ঐ দাবা আর একা উপেন্দ্রনাথ সরকার। তিন বোনের পরিণতি একই রকম। অথবা বলা চলে সরকার মশায় তিন প্রকারে একটি একক পরিণতি বরণ করেছিলেন। অর্থাৎ এখন গল্পটিকে শেষ পর্যন্ত তিন ভাগে বর্ণনা করা চলে। ১. হরেন পালের পুত্রের সাথে সঞ্চিতার প্রেম পর্ব; ২. লাবণ্যর সাথে খালেকুজ্জামানের প্রেম পর্ব; ৩. প্রেমহীন মাধবীর কথা। অথবা চতুর্থ আরেকটি প্রকারে বর্ণনা করা যায়, সেটি হলো– উপেন সরকারের তিন মেয়ের পরিণতি এক পর্বে। ধীরে ধীরে চার প্রকারেই গল্পটিকে বিবৃত করবো। এর পূর্বে জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই ঘটনাগুলো পরে কী ঘটেছিল।

সংসারে মাধবীর বোন, বন্ধু, সাথী বলতে ছিল জ্যেষ্ঠ সঞ্চিতা ও কনিষ্ঠ লাবণ্য। সে সকল কাজেই এই দু'জনকে অনুকরণ করতো। এতে তার বিন্দু পরিমাণ সংকোচ ছিল না। সে ভাবতো এটাই তার জন্য ন্যায্য। বলাবাহুল্য, অন্য দু'জনের মতো রূপ ও মেধা কোনোটাই তার ছিল না। ফলে, সঞ্চিতা ও লাবণ্যর প্রেম হওয়ার পর তারও মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, তার বেলায়ও তাই ঘটুক। কোনো একজন নির্দিষ্ট প্রেমিকের কথা না ভাবলেও যেকোনো একজন প্রেমিকের কথা সে ভাবতো। যে ভাবে অন্য দু'জনের প্রেম হয়েছে, সেও একই ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে চাইতো। এ নিয়ে অন্য দু'জন হাসাহাসি তো করতোই না বরং সাহায্য করতো। সঞ্চিতা ও

লাবণ্যর কীভাবে প্রেম হয়েছে একথা এখানে না বলাই ভালো। বিশেষত সকলে এসব গল্প এতো বেশি করে জানে যে, এই দুইটি ঘটনার একটিরও বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। তাছাড়া আহমেদ ফারুক ঘটনার একেবারে শেষ দিকে দুই দু'টি প্রেমের অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছেন, এতো ভাসা ভাসা করে জেনেছেন, তা নিয়ে কাল্পনিক গল্প তৈরি করা বিশেষ কষ্টকর। হরেন পালের পুত্র রাজীব সঞ্চিতাকে শেষরাতে রেললাইনের উপরে এসে দাঁড়াবার জন্য বলেছিল। পিতামাতার অমতে সে তো আর তাকে ঘরে তুলতে পারবে না। সে বরং তাকে নিয়ে ময়মনসিংহে তার পিসতুতো বোনের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে না সারে। পরে বাবা মানলে মানল, না মানলে...।

সঞ্চিতা উত্তেজনায় ঘুমাতে পারলো না। এমনকি আদরের বোনদেরও জানাবার কথা মনে হলো না তার। সে রাত তিনটার লোকালের শব্দে বিছানায় উঠে বসলো। তাড়াহুড়া করে গুছিয়ে নিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে উঠে এলো রেললাইনের উপর। ভেবেছিল রাজীব আগেই এসেছে। কিন্তু সে এক ঘণ্টা পরেও এলো না। সঞ্চিতা ফিরলো না কিংবা একটুও এদিক ওদিক সরলো না। যদি রাজীব এসে একবারেই খুঁজে না পায়। সে ওইখানেই বসে পড়লো। ঝিমুনি এলো তার। হয়তো ঘুমও পেয়েছিল। দেখাল, স্টেশনে রমনা এক্সপ্রেসের আলো। এই ট্রেনেই তাদের পালাবার কথা। রাজীব হয়তো তখনো ঘুমন্ত। অথবা দ্রুত ছুটে আসছে। অথবা সেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, ছুটে আসা রাজীবকে দেখতে পায়নি। রমনা এক্সপ্রেস এতোটুকু শব্দ না করেও তার শরীরকে তিন ভাগ করে দিয়ে চলে গেল। সঞ্চিতার মৃত্যুর তিন মাস পর লাবণ্য। সেও রাতকে বেছে নিয়েছিল, তবে রাতের প্রথম ভাগ একই জায়গায় সেও মরেছিল তবে লোকাল ট্রেনে নয়, ইন্টারসিটি ট্রেনে। খালেকুজ্জামান হয়তো তাকে নিয়ে পালাবার কথা বলেনি। কেননা রাতের প্রথম অংশ পালাবার জন্য নয়। তবু সে তার দিদির পরিণতিকে নিজের পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অথবা প্রথম রাতে সে স্রেফ একা বেড়াতে গিয়েই ট্রেন কবলিত হয়েছিল, অন্যমনস্ক অবস্থায়। রীতি অনুসারে মাধবীও একই পরিণতি বরণ করতে বাধ্য। তার ভাগ্যেও তা-ই ঘটেছিল। কিন্তু তার লাশ কোথাও পাওয়া যায় নি। সে হয়তো দুই বোনের ছিন্নভিন্ন লাশের পাশে বাবার নির্বাক বোবা মুখটিকে সহ্য করতে পারেনি। তাই একই স্থানে মরেও আপনকার লাশ টেনে নিয়ে কালীগঙ্গায় ফেলেছিল। ধারণা করা যায় তার মৃত্যু হয়েছিল মধ্যরাতে। এই তিনটি ধারাবাহিক মৃত্যুর ঘটনা ছয় মাসের ব্যবধানে ঘটে যায়। উপেন সরকার শুধু নিজেকে একটি প্রশ্ন করেছেন– 'কেন?' তিনি এমনকি রেললাইনে শুয়েও দেখেছেন কোনো মোহ কোনো নিদ্রা কোনো মৃত্যু এসে তাকে আচ্ছন্ন করে কিনা। কিন্তু না ট্রেনের শব্দ পেলেই লাফ দিয়ে সরে গেছেন। পরে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ স্থানটুকুর পাশে গাঁট হয়ে বসে পড়েছেন, আর আহাজারি করেছেন, এ কী হলো, এই-ই মনে মনে বলে। এইসবের তিন মাস পরে আবারও আহমেদ ফারুক অকারণেই বিরামপুর স্টেশনে নেমে পড়লেন এবং আর কোথাও নয়, সেই প্রস্থান বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন, যে স্থান হতে স্টেশন, পতিতালয় ও উপেন সরকারের বাড়ি প্রায় এক পলকে দেখে নেয়া চলে। ওইখানেই উপেন সরকারের

সাথে তার দেখা হলে উপেন্দ্রনাথ সরকার তার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন, মেয়েরা বাড়ি নেই। এইটুকুই।

একটি গল্প– অন্য এক গল্পকারের গল্পের প্রতিলিপি

এখানেও শুরু হতে পারতো, স্বর্ণকারের তিনটি দোকানের যে কোনো দোকানে, তামা-রুপা-সোনা গলানো ধোঁয়াটে বিকালে, এখানেও দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিখ্যাত একজন গল্পকার এভাবে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে রিকশাওয়ালাদের কথোপকথন শুনতেন। এভাবেও মানুষ ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। নিখিল জগতে যে মহাস্রোত প্রবহমান তাতে আমারও অংশ। আমিও প্রবাহিত। ফাঙ্কফুর্টার শাইটুঙ-এর ধর্মান্তরিত সাংবাদিক বলেছিলেন এ কথা। ফলে যে কোনো স্থানেই শুরু হতে পারতো। প্রবহমানতার অনন্তচক্রের মধ্যে যে বিন্দুতে হাত রাখবেন সেটাই সূচনা। এই ভাবনাই ক্রমে সংক্রমিত করে আমাকে। গল্পের শুরু যদি স্বর্ণকারের দোকানে হয় তাহলে এই ক্ষুদ্র বাজারের স্বর্ণ-সঞ্চালনের একটি চমৎকার প্রতিবেদন হয়তো ভেসে উঠবে আমাদের সামনে। বস্তুত গল্পকারের কাছে জগৎ কতিপয় ঘটনার সমাহার। জগতে প্রধানত ঘটনা প্রবহমান– তাই দেখেন তিনি। কবি দেখেন সর্বভূতে উপমা ও ইমেজ, ধার্মিক দেখেন স্রষ্টার অবস্থিতি। কিন্তু স্বর্ণকারের দোকান নির্জন বিধায়, সেখানে জনমানসের স্থির প্রতিবিম্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই ভেবে অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করি।

অন্ধকার দেউটি বাজারে গত ৬ মাস ধরে পল্লীবিদ্যুতের আলো ৯টাতেই নিভে যায়। ৯টা অবশ্য বেশ রাত। তারপরও আমরা থেকে যাই। বটতলার মাছ ব্যবসায়ী-রা সবশেষে ওঠে। সাড়ে ৯টার দিকে। মাছের চাঙ্গাড়ির ভিতর দিনের বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরে তারা। আফসার মদাড়ু তখন বটতলায় দু'জেরিকেন খেজুরের তাড়ি নিয়ে আসে। কখনো খুব দেরি করে ফেলে। সাইকেল হাঁকিয়ে তালপুকুরে রওয়ানাই হয় সে ৮টায়। আসতে দেরি হলে নৃপেনের দোকানে চা খেতে খেতে আমরা উসখুস করি। হ্যাজাক জ্বালানো দোকানে চর্ট মেরে মেরে এগিয়ে আসে মোতালেব মাস্টার। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ তাড়িখোর। ক্লান্ত। জমজমাট বাজারে জিলাপি, সিঙ্গাড়া খেতে খেতে স্থানীয় সমস্যা মিটমাট শেষ হলে এই আসা তার। বলতে গেলে অভিজাত আসর। রাজশাহী ভার্সিটি পাস করা কলেজের হিস্ট্রির প্রভাষক, এনজিওতে কাজ নেওয়া অচল লেখক, বিশিষ্ট মুদি ব্যবসায়ী, কৃষিব্যাংকের সেকেন্ড অফিসার। এখানেও শুরু হতে পারে গল্পের। নৃপেনের দোকানের ঝাঁপ ফেলে মধ্যরাত অবধি

চলা তাড়ির আসরে। কি করে এই তাড়িখোররা দেশকালের বিচার করে। অথবা নানা ঘটনায় আমাদের অংশগ্রহণ নিয়ে। অথবা এখন পর্যন্ত যার অপেক্ষা করছি সেই তাড়ি ব্যবসায়ী আফসারেরও চরিত্র-চিত্রণ করা যেতে পারে। গল্পটা মোটেও টুটুওলার মতো হবে না। আফসারের জীবন্ত অবস্থাতেই গল্পের শুরু হতে পারে। তাড়িই তার জীবন ও জীবিকা। তাড়ি ব্যবসার লাভ থেকে তাড়ি খায় সে, আর আসল থেকে পরবর্তী রাতের জন্য সরবরাহ নিয়ে আসে। শহর ছাড়ার পর যখন গল্প লেখা থিতু হয়ে এলো, একটা দশকেও স্থান হলো বোধহয়, তখন নিত্যকার আড্ডা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, প্রেম ও অপ্রেমের দোলাচল থেকে দেউটি বাজারে চলে এলাম, সম্ভবত গল্পেরই খোঁজে। সামনের ডিসেম্বরে কেটে যাবে ৫ বছর। গল্প খুঁজতে খুঁজতে গল্পের মাঝেই ঢুকে গেছি। কেননা এই প্রবহমানতার আমিও একটি অংশ। প্রথম প্রথম অসুবিধা হতো। সাইকেলে ফিল্ডওয়ার্ক সেরে ঘরে ফিরতাম বিকালবেলা। সন্ধ্যায় নিত্যকার অভ্যাসমতো নৃপেনের দোকানে চা খেতে বসতাম। বাজারের একটু ঘুপচির মধ্যে এই দোকান। কাঁচা বাজারের হৈ-হল-া নেই এখানে। আড্ডা আর প্রেমের প্রবল তৃষ্ণা হতো। গল্পের টেকনিক নিয়ে, কবিতার হালচাল নিয়ে কিংবা দশক বিভাজন নিয়েও কথা বলা যেতো না কারো সঙ্গে। আফসারই এগিয়ে এলো একদিন। স্যার ৯টার পর থাকেন, ভালো জিনিস আছে। আফসার ততোদিনে পরিচিত। জয়রামে বাড়ি। ওর বউ ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে ধানচালের কারবার করে। কেরুর হুইস্কি এনেছিল। ওর মুখ টকটকে লাল আপেলের মতো, চোখ দু'টো ফ্যাকাশে। মুরগির ভুনা রানও জোগাড় করেছিল কোথা থেকে। শামীম ভাইয়ের কথা মনে পড়েছিল হঠাৎ, এ সময়ে শিল্প ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথা হবে না। নট মোর দ্যান থ্রি পেগস। এভাবেই শুরু। খেয়ে এসেছিল আফসারও। ভুসভুস তাড়ির গন্ধ ওর মুখে। দুদিনেই কেরু থেকে স্থানীয় তাড়িতে নেমে এলাম। মুখ দেখলে আফসার বলে দিতে পারে কে কতোবার খেয়েছে আর কে দিওয়ানা। প্রথম রাতে বলেছিল, পেঁয়াজের সব খোসা এক জায়গায় মিলবেই। নেশাখোররা একত্র হবেই।

অথবা রণজিৎ কাকুর মুখ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, শরতে হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ ধূতি, মুখে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। খুব লম্বা। বয়সের কারণে একটু হেলে হাঁটে যে রণজিৎ কাকু। লোক কম হলে নৃপেনের দোকান থেকে বেরিয়ে বটতলাতেই বসি। তখন দেখা হয়। চোখাচোখি হওয়ার উপায় নেই। কারো দিকে তাকান না। তিনি আসলে আফসার এক কাটুয়া তাড়ি বাড়িয়ে দেয় তার দিকে, এক ঢোকে সাবাড় করে আফসারকে ৫ টাকা দিয়ে উঠে পড়েন। আকাশে চাঁদ থাকলে ঘোষপাড়ার দিকে একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো তাকে মিশে যেতে দেখা যায়। পিটার ব্রুকের ধৃতরাষ্ট্রের মতো মুখ। ধবল জ্যোৎস্নায় ধূতি পরা রণজিৎ সওদা ঘাড়ে এক কাটুয়া তাড়ি পেটে নিয়ে ঘোষপাড়ার দিকে হেঁটে যাচ্ছে, গত ৫ বছর ধরে প্রতিদিন। বাজে বকে না, রাস্তাঘাটে দেখা হলেও কথা বলে না। তার মুখের প্রতিটি রেখায় লেখা আছে দেউটির হিন্দু সমাজের উত্থান-পতনের ৫০ বছরের ইতিহাস। এখানেও, রণজিৎ

কাকুর মুখে অথবা তার প্রস্থান দৃশ্যে শুরু হতে পারতো গল্পটার। কিংবা নজু, নুরু, মতিনের প্রাত্যহিক বিতণ্ডায়। প্রতিদিন খায় তারা। খেয়ে আর অপেক্ষা করে না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার অজুহাতে একজন আরেকজনকে টানতে টানতে উঠে পড়ে। কিন্তু মসজিদ মোড় পর্যন্ত গিয়ে প্রচণ্ড বিতণ্ডা লাগায়। পানের পিক ফেলা, হোটেলে পিরিচ ভাঙা কি দেনা ১০ টাকা নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়। কেউ আসে তাদের অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনতে, কেউ মীমাংসা করতে, কেউবা একেকজনের পক্ষ নিতে। এক বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বহু বিষয় টেনে আনা তাড়িখোরদের স্বভাব। ফলে, অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রোতারা তাড়িখোরদের বানানো গোলকধাঁধায় আটকা পড়ে, সমাধান আর হয় না। শেষে মুরব্বি গোছের কেউ এসে তিন তাড়িখোরকে থাপ্পড় মেরে বাড়ি যা ব্যাটা, নিন আয়, বললে তারা সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে ফিরে যায়। সবচেয়ে শান্ত থাকে মোতালেব মাস্টার। মুখ না শুঁকলে বোঝার উপায় নেই। তখন হয়তো ১১ কি ১২টা। অগ্রহায়ণের চাঁদ মাঝআকাশ পেরিয়েছে। জীবনানন্দ অঘ্রাণ বলতেন। একজন ব্যর্থ গল্পকার দেউটি বাজারের দক্ষিণ প্রান্তে নিজের থাকার জায়গায় ফিরতে ফিরতে জীবনের প্রাচুর্যময় ভাঁড়ার নিঃশেষ করার কথা ভাবছে। মুখে তার তাড়ির কুয়াশা মাতানো গন্ধ। এ রকম সময়েই হয়তো হাজার বছর যাবৎ পথ হাঁটার কথা মনে হয়। আত্মকথন, সেখান থেকেও শুরু হতে হতে পারে গল্পের।

সাত সকালে শুরু হয় প্রতিটি দিনের। গোসল, নাশতা, তারপর ফিনিক্স সাইকেলে অফিস, ফিল্ডওয়ার্ক। মেয়ে কর্মীর সঙ্গে সুযোগ বুঝে ফষ্টিনষ্টি। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ প্রকল্প– আজ জয়রাম, কাল শ্রীপতিপুর, পরশু নওলা। আফসারের বাড়ির পাশে জয়রাম উপকেন্দ্র। চেতন থাকলে খোঁজ-খবর নিয়ে যায় দু'একবার। প্রায় দিনই অবশ্য ঘুমে অচেতন থাকে অথবা গ্রাম ঘুরে ঘুরে গালিগালাজ করে বেড়ায় একে ওকে। বয়স্ক কাউকে দেখলে পা ধরে মাফ চায়। একঝাঁক উৎসাহী কিশোর তখন তার পিছু নেয়। মাঝে মাঝে তাদের তাড়া করে আফসার, ঢিল ছোঁড়ে। তাড়া খেয়ে খানিক দূরে গিয়ে আবার তারা আফসারের কাছে ভেড়ে। আফসারের সঙ্গে লোকজনের কথোপকথনের মজা নেয়। তার খিস্তি-খেউড় শোনে। মাদক মনে হয় এক প্রকার প্রচারের বাসনা এনে দেয়। অনুসরণকারী ছেলেপেলের দল ক্লান্ত হয়ে সরে পড়লে আফসার দিনের আলোতেই আমতলার ছায়ায় কিংবা স্কুলঘরের বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়ে। যৌনকর্ম, নেশা, সাহিত্য এই দিন কর্মের ৫০ শতাংশ তৃপ্তি প্রচারে। কতোজন আর রাশি রাশি পৃষ্ঠা গল্প, উপন্যাস, কবিতা ট্রাঙ্কে জমিয়ে রাখতে পারে? ১৯৫৩ সালে জীবনানন্দ যখন একটি পত্রিকার কর্মীদের বারবার লেখা নেই বলে ফিরিয়ে দিচ্ছেন তখন তার হাতে পৌনে ৫০০ কবিতা জমা ছিল। কী উদ্দেশ্য ছিল তার। জীবনানন্দকে নিয়েও একটি চমৎকার শুরু হতে পারে। বরিশালে শচী নামের এক গ্রাম্য মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। ডায়রিতে শচীর কথা লেখা আছে– সংকেতে। প্রথম প্রথম কেউ চিঠি লিখতো, গ্রামের নানা বিষয়-আশয় নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে ট্রাঙ্ক ভরাচ্ছি না কেন। আমার শহর থেকে এই প্রস্থানকে নির্জনতার

দায়ভার চাপিয়ে এ্যাপ্রিশিয়েট করতো। ৫ বছরের দীর্ঘ বন্ধ্যাত্ব চিঠিগুলোকে স্-ান করে দিয়েছে। মনেপ্রাণে কিন্তু গল্পকারই রয়ে গেছি। গত ৫ বছরে, মোক্ষম একটি গল্প লিখে ওঠার কথা ভুলিনি। কোথাও মনে হয়নি এখান থেকে, যে কোনো স্থান থেকে শুরু হতে পারতো না। একজন লেখক বন্ধু আমার মতো ভাবতো না। ঘটনাস্রোতকে গল্প বলে ভাবতো না সে। স্রোতের মধ্যকার দু'একটা উজ্জ্বল মাছকে গল্প বলে ভাবতো। দেখা যেতো, গ্রিসের বিরহ নাটকের আদলে তার গল্প আকস্মিকভাবে বেড়ে উঠছে। দৈনন্দিনতার মাঝে গল্প নেই, বলতো সে। রাজধানী ব্যস্ততম এলাকার একটি মেয়ে, সম্ভবত গার্মেন্টস শ্রমিক, তাকে হাত ধরে টানছে একটা ছেলে। মেয়েটা বাধা দিচ্ছে। ছেলেটা তাকে চড় মেরে বসলো। আমরা গল্পকাররা ছাড়া তাদের দিকে তাকাচ্ছে না কেউ। এমনই ব্যস্ত সে বাস স্টপেজ। সে বললো, এই মেয়ের লজ্জিত, অপমানিত মুখ থেকে শুরু হবে তার গল্প। মেয়েটার চরম সংকটকালে। আশ্চর্য এক উদ্ভাস, বিস্ময় দিয়ে শেষ হবে তার গল্প। তখন হয়তো মেয়েটি রাত ২টায় ঘরে ফিরছে– লাঞ্ছিত, ধর্ষিত হয়ে। সমালোচনা করতাম আমরা। গল্প তো বিরহ নাটকের মঞ্চ নয়। এর শেষও নেই, শুরুও নেই। একটি প্রবহমানতার সংকলিত অংশবিশেষ হলো গল্প। পাঠক নাকি বিরহ নাটকই শুনতে চায়, বলতো সে, টোটালিটির দিকে ঝোঁক নেই তাদের। সর্বশেষ চিঠিটি এসেছিল গত বছরের জুনে। আফসারকে তখন বছরের রুটিন মাফিক মসজিদের শালিসে তওবা করতে হয়েছে। তওবার সারমর্ম হলো– সে আর মদ-তাড়ি বিক্রি করবে না অথবা খাবে না। নামাজ পড়বে নিয়মিত। সপ্তাহখানেক তাই করতো সে। ছাকরবান্দির কাজ করতো– রোজগারের উপায় হিসেবে। এই সপ্তাহটিতে খুব অসুবিধা হতো আমাদের। প্রধান সাগরেদকে ব্যবসা বুঝিয়ে দিতো আফসার। সপ্তাহখানেক কেটে গেলে হঠাৎ করে লাপাত্তা হয়ে যেতো সে। শ্যামনগর, বোয়ালমারি অথবা বসন্তপুর যেতো। রাতভর তাড়ি খেয়ে দুলালের শালা, রানীপুকুরের কয়েকজন বিশিষ্ট তাড়িখোর এবং পুঁটিমাটির মিতা আফসারকে নিয়ে ভোর ভোর ফিরে আসতো। ফজরের নামাজ শেষে মুসলি-রা রাস্তায় বের হলে তাদের সামনে গুরুতর কোনো সমস্যা উত্থাপন করতো। কোথা থেকে একটা ট্রাক্টর জোগাড় করে তাতে চেপে আসতো তারা। মুসলি-রা তাদের গুরুতর সমস্যা সমাধান করতে পারতো না। ফলে তারা বকতে বকতে রওয়ানা হতো মোতালেব মাস্টারের বাড়ির দিকে। সকালের নাশতাপানি করে বিদায় নিতো সেখান থেকে। এ রকম কাল্পনিক সমস্যা দিয়ে গ্রামবাসীকে উত্তেজিত করে শুরু হতে তার নতুন উদ্যমের তাড়ি ব্যবসা। প্রথম সপ্তাহে গোপনে। পরে স্বাভাবিকভাবে। এরকম একটি একটি দিনেই এসেছিল চিঠিটা। গল্পকার বন্ধুর। তুমি যখন ৫ বছরে ক্ষুদ্র আকারের একটি গল্পও লিখে উঠতে পারলে না তখন একটি উপন্যাসই লিখো। সমগ্রতার দিকে তোমার এতো ঝোঁক। তোমার নন্দন বিশ্বে কোথাও হয়তো উপন্যাসের বীজ রয়ে গেছে। জেমস জয়েস বলেছেন, A short story is a slice of a watermelon. তুমি গোটা তরমুজটাকে নিয়ে ভাবো না। সঙ্গে গত বইমেলায় প্রকাশিত গল্প পুস্তক।

সাতটি গল্প ৮০ পৃষ্ঠা। ধূসর রঙের প্রচ্ছদ। 'একটি আখ্যানের জন্ম'। পড়াও হয় না ইদানিং। সারাদিনের ব্যস্ততার পর নৃপেনের দোকান। ১১ কি ১২ টায় ঘরে ফিরে মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়া। কচি লেবু পাতার মতো নরম ভোর পর্যন্ত। কখনো এই রাত দীর্ঘতর হয়। শুক্রবারে বিশেষ করে। কাজের মেয়েটা সকালের নাশতা বানাবার অপেক্ষায় সে পর্যন্ত বসে থাকে। কোনো কথা বলে না। কালো রং। দাঁত সাদা পৃষ্ঠার চেয়েও উজ্জ্বল সাদা। তাকে নিয়েও মাঝে-মধ্যে যৌনতা খেলা করে মনে। বয়স ১৪, বিবাহের বয়স হয়েছে। কিন্তু তার বিয়ে নিয়ে কেউ ভাবছে কি? আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পারস্পরিক অসম সম্পর্ক নিয়েও দিব্যি চমৎকার গল্প লিখেছেন। রতন। এই মেয়েটার নাম রতন নয়। কেউ তাকে ডাকছে, সেই ডাক শুনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে। দেখি আফসার ঢুকছে। এরকম প্রায়ই আসে। কখনো সন্ধ্যায়, মেয়েটির হাতে বাজার ধরিয়ে দিয়ে যায়। ব্রাশ করতে করতে আফসারের বৃত্তান্ত শুনি। সে কোনো কথাই প্রকাশ্য করে বলে না। তার সব কথাই গোপন। বাস্তব বা কাল্পনিক কোনো না কোনো ঘটনা ঘটিয়েই তবে সে আসে। ভাইজান, উঁচাভিটায় একটা বিয়া করছিলাম। সে সমস্যা অনেক আগের। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা আফসারের পরিবারও জানে। তালপুকুরের পাশেই একটা একাকী বাড়িতে মেয়ে আর তার বৃদ্ধ বাপের বাস। বৃদ্ধ বাপকে বিনা পয়সায় তাড়ি সরবরাহ করতো আফসার। প্রথম প্রথম বিয়ে না করেই মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে। জানাজানি হলে বিয়ের কথা রটনা করেছে। একদিন এই প্রেমিকার জন্য ক্ষুদ্রঋণের আবদার নিয়ে এসেছিল। উজ্জ্বল তামাটে বর্ণের সে মেয়ে। মুখে কটু গন্ধ। এই মেয়েটা আসার আগে সপ্তাহ দু'য়েক সকাল-সন্ধ্যা রান্নাবাড়িও করে দিয়েছে। শুধু আড়ে আড়ে চায় আর হাসে। নেরুদা ভারতীয় মেথরানীকেও শয্যাসঙ্গিনী করেছেন। অনুস্মৃতিতে আছে। আমার এই বোধ আফসার বোধহয় বুঝতে পেরেছিল খানিকটা। তাই তড়িঘড়ি এই মেয়েটাকে নিয়োগ দিয়েছে তার স্থলে। সেখানেও শুরু হতে পারতো, অথবা আজকের সংবাদে। তালপুকুরে অর্থাৎ উঁচাভিটার সংসারে নতুন সদস্য আসছে আফসারের। এই নিয়ে আগের পক্ষের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ। কাজ কী বিবাদে। আল-ায় দিলে দু'বউই স্বনির্ভর। একজন ক্ষুদ্রঋণের টাকায় ধানচালের করবার করে। ধান মাড়াই করে চাল বিক্রি করে। আরেকজন বাড়ির ধারে ছোট্ট পান-সুপারি বিড়ি-বিস্কুটের দোকান চালায়। আফসার চলে তাড়ি বিক্রি করে। এবার কোনো সমাধান চায় না। বরং আপনজন মনে করে জানান দিয়ে চলে যায়। বিকালে কৃষি ব্যাংকের সেকেন্ড অফিসার আসে। তার মুখে এখন বিয়ের তত্ত্ব-তালাশ। তার স্ত্রীর খালাতো বোন আগামী সেশনে ডিগ্রি পরীক্ষা দেবে। তার পরামর্শ হলো, টাউনে জমি কিনে এখানেই সেটল করেন। সেসব প্রসঙ্গে সহজে যেতে দেই না তাকে। অন্য প্রসঙ্গে যাই। জলিল ভাই, জীবনের কোন ঘটনাকে এই ৩৭ বছরে আপনার কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো। প্রশ্ন শুনে গভীর চিন্তায় পড়ে যান তিনি। নিজে অনেকবার ভেবেছি। জন্মদিনগুলোতে আবশ্যিকভাবে। আমাদের কোনো উজ্জ্বল তাৎপর্যপূর্ণতা

নেই। একটা নিস্তরঙ্গ জীবন। কেউ কারো থেকে মৌলিক উজ্জ্বলতায় ভাস্বর নই। যে বন্ধু গল্পের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকে তার কথা ক্ষণিকের জন্য মনে পড়ে। কী মানদণ্ড দিয়ে সে মেপে চলেছে তাৎপর্যপূর্ণ কিংবা অতাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলোকে আর একের পর এক গল্প লিখে চলেছে? জলিল সাহেবকে হয়তো একটি গল্পের দিকেই ঠেলে দিয়েছি। মাত্রার জন্মের কথা বললেন তিনি। কন্যার জন্মের পর তার মনে হয়েছে জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটে গেছে। বিয়ে করে সংসারি হলে বুঝবেন– তার প্রসঙ্গের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে আসেন তিনি। এক লাফে। এভাবে প্রসঙ্গে এলে লোভ জাগে খানিকটা। মাত্রা নামটা আমারই রাখা। মাত্রার খালা, কোথাও একটা শিহরণ খেলা করে। মাত্রার আম্মু আজ রাতে আপনাকে দাওয়াত করেছে। দূর নয় মোটেও তার বাড়ি। দেউটি বাজার থেকে কোয়ার্টার কিলোমিটার। মাত্রা ইদানিং খুব ন্যাওটা হয়েছে আমার। শুধু গল্প শুনতে চায়। বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলি তাকে। সাড়ে ৩ বছরের মাত্রা আজ খালামণির কোলে করে আসে। জলিল সাহেব পরিচয় করিয়ে দেন– এই হলো শিউলি, ওর খালাতো বোন। শিউলি যেন খানিকটা লজ্জা পায়। তার বোনকে কানে কানে কী বলে পাশের ঘরে চলে যায়। লগ্ন শুভ নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেলো। জলিল সাহেব এ কথা সে কথার পর আবার ডাকেন তাকে। রান্নার খবর নেওয়ার অজুহাতে শিউলিকে বসিয়ে রেখে চলে যান। আপনি তুমিতে কিছুক্ষণ কেটে যায়। তারপর পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা, গল্প-উপন্যাস। হুমায়ূন আহমেদের মস্ত পাঠিকা সে। তিথির নীল তোয়ালে পর্যন্ত পড়া আছে। প্রিয় উপন্যাস শ্রাবণ মেঘের দিন। চুলগুলো অযথাই মুখে এসে পড়ে বারবার।

ভরা পেটে ফেরার পথে আজকেও নৃপেনের দোকান। দেউটি বাজারের তাড়িখোর রাত। চাঁদ মধ্যআকাশে উজ্জ্বল রূপালি। নিচে ঘন কুয়াশার আস্তরণ। Life is a long journey throuth man to man. দোকানে দোকানে কুপি বাতির ক্ষীণ উজ্জ্বলতা। দু'একটি ক্লান্ত দোকান। এই দীর্ঘ বছরগুলোতে কাউকে কি কথা দেওয়া হয়েছে কোথাও? দায়বদ্ধতা? কালের ধুলোয় চাপা পড়ে গেছে কোনো উজ্জ্বল ঘটনা? অঘ্রাণের রাতে মুখর একাকী বাড়ি ফেরা।

ভোর, সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল। একঝাঁক রোদের রশ্মি 'একটি আখ্যান জন্মে'র ওপর এসে পড়েছে। ধূসর প্রচ্ছদের ওপর এক আস্তর ধূসরতর ধুলো। হঠাৎ মনে পড়ে এতো আমার সেই গল্পকার বন্ধুরই পাঠানো বই। তারই লেখা। এতদিনেও ওলটানো হয় নি। ঈর্ষা, অসূয়া? নাকি অনাগ্রহ। আজ সকালে আবার পড়ে দেখার ইচ্ছা হলো। শেষ গল্পটা– 'একটি আখ্যানের জন্ম'। নতুন আর এমন কী! তবু গল্পটা একবার পড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। রান্নার জন্য রতনের থালাবাসন মাজার শব্দ আসে। মেয়েটাকে আজ থেকেও রতন বলে ডাকা যেতে পারে। সে হয়তো দাদাবাবুর দেওয়া পড়া নিয়ে

বড়োই ভাবিত। একটি বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে দেখে এই ভোরের ভাবনা নিয়েও শুরু হতে পারে। একটা অস্তিত্ববাদী গল্প। রতন এবার ডাকতে আসবে। সকাল সকাল অফিস আছে। রতনের ডাক শোনা পর্যন্ত ভোরের আলোয় বইটা মেলে ধরা যাক। কৃত্য প্রকাশ। বইমেলা ১৯৯৯। ১১০০, বাংলাবাজার, ঢাকা। স্বত্ব লেখক। উৎসর্গ– সেইসব বন্ধুদের, যাদের নৈঃশব্দও আজ বড়ো উজ্জ্বল হয়ে চোখে লাগে। ৭ম গল্প 'একটি আখ্যানের জন্ম'। ইদানিং ওর শুরু কেমন হয় কে জানে। গল্পটা বের করি। শুরুটায় চোখ আটকে যায়। এখানেও শুরু হতে পারতো, স্বর্ণকারের তিনটি দোকানের যে কোনো দোকানে, তামা-রুপা-সোনা গলানো ধোঁয়াটে বিকালে, এখানেও দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিখ্যাত একজন গল্পকার এভাবে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে রিকশাওয়ালাদের... উত্তম পুরুষে লেখা। একজন গল্পকারের গল্প শুরু করার সংকট নিয়ে লেখা গল্প। দরজায় রতনের কড়া নাড়ার শব্দ পাই– দাদা বাবু, দাদা বাবু। এমনকি এখানেও শুরু হতে পারে গল্পটির।

সর্পরাজের গল্প

শ্রীপতিপুর হাট বসে সোম, শুক্র– সপ্তাহে দুইদিন। কোচাশহর শনি, মঙ্গল। এই দুই হাট পাশাপাশি। রিক্সা, বেবি, ভ্যানে নিয়মিত যাতায়াত আছে দু'হাটের মানুষের। শ্রীপতিপুর কোচাশহরের দশগ্রাম পরে ডানে ও বায়ে ধামুর হাট ও কাজী পাড়া। তারও ডান বায়ে সামনে পিছনে দামুর চাকলা, মাঝিপাড়া, বরাইবাড়ি, সাতগাঁও, অষ্টবক্র, শুকানদিহি। এত এত হাটের মধ্যে পাশাপাশি দুই হাট কিন্তু একদিনে বসে না। শ্রীপতিপুরের বিশগ্রাম পরের সাওগাঁও হয়তো সোম, শুক্রবারে। আবার অষ্টবক্র শনি, মঙ্গলে বসে। এত বড় ভূগোলের সব হাট মিলে পর্যায়ক্রমে সারা সপ্তাহ পূর্ণ করে। কোনো কোনো হাটে হয়তো হাটবারই নেই– যেমন গোডাউনের হাট। শুকানদিহির বন্দর বন্দর ভাবটা গোডাউনের হাটের লোকসমাগমটাকে খেয়ে ফেলেছে। তবু দু'চার ঘর দোকানপাট মিলে গোডাউনের হাট সন্ধ্যাবেলা টিমটিমে বাতির আলোয় বসেই বসে। তাই বলে গোডাউনের হাট এলাকার মানুষের হাটবার নেই, এমন নয়। শুকানদিহির হাটবারই গোডাউনের হাটের হাটবার আবার অষ্টবক্র খানিক দূরে হলেও অষ্টবক্রের হাটবারও গোডাউনের হটের হাটবার। হাটুরে লোকের শুধু শুধু হাটবার খোঁজে। হোটলে বসে সুড়ত সুড়ত করে চা খায়। পান খায়। আর বিড়ি ধরিয়ে গুলতানি মারে। শ্রীপতিপুরের পাকা হাটুরেরা কোচাশহরের হাটবারে যাবে না, তা হয় না যাবে, চা-বিড়ি খাবে। পরিচিত হাটুরেদের দাওয়াত দেবে। সমাজ-সংসার নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে দু'চারটা গালগল্প করবে। কেউ কেউ হয়তো আগ বাড়িয়ে ট্রেনে চেপে কাজীপাড়া পর্যন্ত যায়। সেভেন আপে গিয়ে নাইন ডাউনে ফিরে, রাস্তায় তিন ব্যাটারি টর্চ মেরে মেরে বাড়ি ফিরবে। হাট মানে তো হৈহল-া, চিৎকার, চেঁচামেচি, এলাকার নেতা, টাউট-বাটপার, ছেলে-ছোকড়া, নেশা-ভাংখোরদের আখড়া। হাট থাকলে মজমাও বসে। কেউ হয়তো হারাগাছে প্রস্তুত নতুন ব্রান্ডের বিড়ি বিক্রির মজমা বসায় এককোণে। কেউ হয়তো নতুন দাঁতের মাজনের গুনাগুন বর্ণনা করে সবার সামনে দাঁত পরিষ্কার করে সাদা ফকফকা দাঁত

দেখিয়ে কোম্পানির পক্ষ থেকে ৫ টাকা কনসেশনে তিন টাকায় মাজনের শিশি বিক্রি করে। ম্যাজিশিয়ান আসে জীবন্ত মানুষের মাথা থেকে মুরগির ডিম বের করে কবুতর বানিয়ে উড়িয়ে দিতে। আসে সিফিলিস, গনোরিয়া, অর্শ, ভগন্দর, লিঙ্গের দুর্বলতা, মা-বোনদের অনিয়মিত ঋতুস্রাব, মোটা সরু ছোট দুর্বল লিঙ্গের মহৌষধ নিয়ে, আমবাত, শরীরের গিটে গিটে বাত, ক্যান্সার, যক্ষা, ম্যালেরিয়া সর্বরোগের মহৌষধ নিয়ে আসে কোনো এক কবিরাজ। সারা হাটে মাইক বাজিয়ে কুমিল-ার আশ্চর্য ফলের টনিক নিয়ে প্রতিহাটে আসে আরেক জন। খালি বোতল জমা দিয়ে আট টাকা কনসেশনে কুমিল-ার আশ্চর্য ফলের টনিক। আর আসে সর্পরাজ। যাদুটোনা, নামাজ শিক্ষা, বেহেশতী জেওর, আতর, তসবীহ বিক্রি করতে আসে টুপিপরা হুজুরেরা। এরা না থাকলে হাটই জমে না। মাঝে মাঝে মানিকগঞ্জ, ঘিওর কিংবা শরিয়তপুর থেকে আসে ওস্তাদ যাদুকর! আস্ত মানুষের লিঙ্গ গায়েব করা খেলা দেখিয়ে চলে। এখন লিঙ্গ গায়েব হয়ে যাওয়া লোকটি ভয়ে চেঁচামেচি করে তখন মজমায় উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা নিজ নিজ লিঙ্গ বাঁচানোর জন্য টাকাকড়ি ফেলে চুপচাপ সটকে পড়ে। এইসব হাজার কিসিমের মজমা না থাকলে বড় হাট কোনও বড় হাটই না। ছোট হাটেও এরকম দু'একটা মজমা লাগেই লাগে। কিন্তু বাদলা দিনে? যখন আকাশ থমথম করে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি বাদলা চলে সাত আট দিন যাবত? মাছহাটির রাস্তায় কাদা জমে যায়, তরকারিহাটিতে পানি জমে চলাচল প্রায় বন্ধ, মুরগিহাটির মুরগি ভিজে নেসতে যায়, চালহাটির দোকানের চাল চুয়ে চুয়ে পানি পড়ে চলের বস্তায়, তখন? এরকম হঠাৎ হলে হয়তো হাটই বসে না। বসে না বললে তো আর বসেই না এমন নয়। বসে বটে তবে হাট বলতে যা– তার আর জমে না। কান খাড়া করে লোক সমগমের গমগমে আওয়াজটা আর পাওয়া যায় না। বাজার-সদাই করে লোকজন মজমা শুনতে দাঁড়াবে কি এককাপ চা খেতেও বসে না। কিন্তু বৃষ্টি যদি দিনকে দিন চলতেই থাকে, বন্যার সময় হয়তো তিন মাস, চার মাস, কি পাঁচ মাসই বাদলা থাকলো, এর মধ্যে কি যাদুকর, মাজন বিক্রেতা, কবিরাজ, সর্পরাজরা উপোস করে। নাকি মানুষের তুকতাকের দরকার, অসুখ-বিসুখ বন্ধ হয়ে যায়? বৃষ্টি বাদলা মেনে নিয়েও কিন্তু সমানে চলতে পারে এইসব। স্কুল ঘরে, ঘরের বারান্দায়, ইউনিয়ন পরিষদের বারান্দায়, সরকারি কসাইখানায় অথবা যে কোনো বেওয়ারিশ চালার নিচে। অথবা শ্রীপতিপুরের মতো জায়গায় যেখানে হাটের পাশে রেলস্টেশন– সেখানে স্টেশন হলো বৃষ্টি-বাদলা, রোদ-খরা সব সময়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা। মজমা বসানোর জন্য যেমন বেওয়ারিশ জায়গা চাই তেমন জায়গাই হলো রেলস্টেশন। ধরা যাক, এমন এক ঝিরিঝিরি বাদলার দিনে রেল স্টেশনের প-াটফর্মে মজমা বসালো এক গুণধর সর্পরাজ। ওঝা নয়, সাপুড়ে নয়, ইত্তেফাকে ছবি ছাপা হয় এমন এক সর্পরাজ। মাথার চুলে ঢেউখেলানো, তাতে আবার চপচপে তেল মাখানো, পুরু গোঁফ, সাদা পাঞ্জাবী, ঝকঝকে লুঙ্গি আর ঘাড়ে নতুন গামছা ঝোলানো। কেউ দেখেনি এই সর্পরাজ দুই ঝাঁকা সাপ নিয়ে ট্রেন থেকে নেমেছে নাকি বাস ধরে

কাজীপাড়া নেমে সেখান থেকে ভ্যানে করে এসেছে। এলাকার কেউই তাকে কোনো দিক থেকে আসতে দেখেনি। এমনকি ট্রেন, বাস কি ভ্যান থেকে নেমে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে সর্পরাজ পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে কপালে হাত তুলে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিল তাও দেখেনি কেউ। দেখলেও উনি যে বিখ্যাত সর্পরাজ তা বুঝতে পারেনি। অথচ হাটের সবচেয়ে বড় মজমাটা বসিয়েছে এই সর্পরাজই। ম্যাজিক, তাসের খেলা, গল্প, গান যে কোনো একটা কিছু করতেই হয় মজমায় লোক টানার জন্য। লোকজন দূরে দূরে থেকে সর্পরাজকে আড়চোখে নিরখ করে। লোকেরা এবং সর্পরাজ উভয়ে পরস্পরকে নিজের দিকে টানে। অপেক্ষা করে নতুন ঘটনা ঘটার। প্রথমে ডুগডুগি বাজায় সর্পরাজ স্টেশনে ছড়ানো ছিটানো ছেলেপেলে ছোকরারা এসে ভিড় জমায়। একটা গোল দাগ দেয় সর্পরাজ, দাগ দেবার সময় বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে, ছেলেপেলেদের দাগের বাইরে ঠেলে দেয়, দাগের আকার দেখে বোঝা যায় কত লোক আশা করে সে। দাগ দিয়ে একটা বিড়ি ধরায়, এক এক করে সাপের বাক্স ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখে সামনে। একটা সাইডব্যাগ আর একটা প-াসটিকের পোর্টফোলিও রাখে ডানে বামে। সবকিছু গোছানো হলে ডুগডুগিতে আরো একদফা বাজনা তোলে। তখন স্টেশনে আটকা পড়া লোকজন এগিয়ে আসে, কেউ বসে, কেউ বা দাঁড়িয়েই থাকে। নেতা গোছের কেউ এসে বিড়ি ধরায়, আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ে, লুঙ্গির খুটা একটু তুলে বলে, খেলা শুরু করেন সাপুড়িয়া। কাজী পাড়ার ট্রেন ধরতে আসা দু'চারজন ব্যাপারি এক ফাঁকে মজমায় ঢুকে পড়ে। সর্পরাজ যখন দেখে ভিড় তার কথা শুরু করার মতো ঘন কিনা। প্রথম সারিকে বসিয়ে দেওয়ার পর দাঁড়ানো দ্বিতীয় তৃতীয় সারি এবং এর বাইরে আরও দু'চারজনকে উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখে সর্পরাজ গলা খাকারি দেয়। কথা শুরু করে। শুরু করে আমি সাপুড়িয়া না, ওঝাও না, সাপ খেলা দেখাই না, তাবিজ বিক্রি করি না। আমার বাপ দাদারা ওঝা ছিল। আমি সাভারের টুন্নু মিয়া ওঝার নাতি মান্নাফ মিয়া। পেপার পত্রিকায় আপনারা যে সর্পরাজের ছবি দেখেন আমি সেই সর্পরাজ। লোকেরা একটু টাসকি খায়। তবে কি ইনি ঔষধ বিক্রি করেন? তারা ভাবে এ কোন সর্পরাজ সাপখেলাও দেখায় না, ঔষধও বিক্রি করে না, কী করে তবে এত সাপ নিয়া? সর্পরাজ তার পোর্টফোলিও থেকে একটা কাগজ বের করে শিক্ষিত গোছের এক ছেলের হাতে দেয়, ছেলেটা বিজ্ঞাপনের ছবির সাথে সর্পরাজ মান্নাফ মিয়ার চেহারা মেলায়, মজমা তার দিকে তাকালে মাথা নাড়ে। সে মাথা নাড়লে লোকজন বিশ্বাস করে ইনিই পত্রপত্রিকার সেই সর্পরাজ। এই প্রমাণটা দাখিল করার পর সর্পরাজ আবার শুরু করে : নিবাস সাভারের বংশাই নদীর তীরে, বাজার রোড। বাড়িতে একটা সর্পখামার আছে। আর তেত্রিশ জন ছেলেকে আমি তন্ত্রমন্ত্র শিখাই। সর্পখামার আছে, তবে আমি সাপের বিষ বিক্রি করতে আসছি? না, তাও না। পরশুদিন কাজীপাড়ায় একজন, কাল শুকানদিহিতে একজন বলে, সর্পরাজ, আমরা সাপের বিষ কিনতে চাই। আমি বলি, ভাই সাপের বিষের দাম লাখ টাকা। তবে কি সাপের বিষ পাওয়া যায় না? টাকা থাকলে বাঘের দুধও পাওয়া

যায়, কিন্তু ভাই আমি সঙ্গে সাপের বিষ আনি নাই। সাভারে আছি আমি ত্রিশ বছর। সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জে লোকে আমাকে এক ডাকে চেনে, আপনাদের এলাকায় আসলাম এই প্রথম। সাভারের আগে থাকতাম কামরূপ-কামাখ্যা। বাংলাদেশের ঠিক মাথায় উপর উত্তরে আসাম। নিজের গল্পটাকে আসামে নিয়ে গিয়ে সর্পরাজ মান্নাক লোকজনের মুখের দিকে তাকায়। এই বর্ষায় সর্পরাজ বেছে নিয়েছে তার নিজের জীবনের গল্প। ভুল-ঠিক মিলিয়ে তৈরি করা। তাই শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া পরখ করে নিঃসন্দেহ হয়। যৌবনে মাথা ছিল গরম। বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম কামরূপ-কামাখ্যা। আসামে আছে গোহাটিতে কামাখ্যার মন্দির, সেইখানে না। আসামের উত্তরে নাগাল্যান্ড, নাগাল্যান্ডের গহীন জঙ্গলে-কামরূপ কামাখ্যা। সে এক আজব দেশ। হাট থেকে কুকুর কিনে এনে জবাই করে খায় মানুষে। ট্রেনের গায়ে ধাক্কা লেগে হাতি মরে থাকে। সেই হাতির গোস্ত খায় নাগারা। সেই দেশে ছেলের চেয়ে মেয়ে বেশি। মেয়েরা ছেলে দেখলে তাকে বন্দি করে জঙ্গলে নিয়ে যায়। কাপড়-চোপড় বলতে কিছুই পরে না তারা। ছবি আছে, সময় মতো দেখাবো। সেইখানে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত উঁচু নাগমন্দির, হাজার হাজার নাগ-নাগিনী সাপ-সাপিনীর বাস, আর আছে তন্ত্রমন্ত্র জানা ন্যাংটা গুরু-সর্পসাধক। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম সেই দেশে। সর্পরাজ এবার উত্তরে তাকায়, দক্ষিণে, পশ্চিম, পুবে তাকায়, লোকের চোখেমুখে গল্পের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে। বহু গল্প, জমা আছে ঝুলিতে, বেহুলার ভাসান যাত্রার গল্প, চাঁদ সদাগরের সাথে মনসার মনকষাকষির গল্প, বাসর ঘরের গল্প, আবার নানান জায়গায় সাপ ধরে বেড়ানোর গল্প আছে, ঔষধ আবিষ্কারের গল্প আছে। এই বর্ষায় সর্পরাজ বেছে নিয়েছে তার নিজের গল্প কীভাবে সে সর্পরাজ হলো সেই গল্প। এলাকাটা নতুন, গল্পও নতুন। কাজীপাড়া, শুকানদিহিতে প্রতিক্রিয়া ছিল ভাল, জমজমাট মজমা হয়েছিল, রাত্রে সর্পরাজ গল্পটা আপন মনে ঝালিয়ে নিয়েছে আর ভেবেছে– শুধু তো গল্প নয়, এটা হলো নিজেকে নায়ক বানানোর প্রক্রিয়া, বিশ্বাসযোগ্য অস্তিত্বকে একটা অবিশ্বাস্য অস্তিত্বে স্থাপন। এই গল্পের ভার বেশি। চিরদিন ধরে তার দাদা পরদাদা, গুরু, দাদাগুরু যেসব গল্প বলে মজমা করে তা তো নয়। এ হলো আনকোরা এক গল্প। গল্প বলতে বলতে তার মনে কোথাও একটু মেঘ জমে। সে বোঝা এ হলো– দর্প, অহংকার। আঙ্গুল তুড়ি বাজালে তার এই ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু কামরূপ-কামাখ্যায় গেলেই কি গুরু ধরা যায়? সেখানে তো হাজার গুরু, সর্পসাধক। সহজে কি তাদের শিষ্য হওয়া যায়? আমি একলা জোয়ান ছেলে, এ মন্দির ও মন্দির ঘুরি, ধ্যানে মত্ত গুরুদের দেখি আর গুরু ধরার ফন্দি-ফিকির করি। দিন যায়, মাস যায়। এই ভাবে তিনমাস কেটে গেল। একদিন পাহাড়ের ঢালে এক আকাশ সমান মন্দিরের সিঁড়িতে ঘুমাইয়া পড়ছি। সে মন্দিরের মাথা মেঘ ছোঁয়ছোঁয়। ঘুম ভাঙতে দেখি মন্দিরের মাথা দেখা যায় না, মন্দিরও বোঝা যায় না। দেখা যাবে কি, তখন একবারে রাতের অন্ধকার। পথ-ঘাট চিনি এমনও মনে হয় না। সাহস করে গিয়া মন্দিরে উঠলাম, গিয়া দেখি মন্দিরটা সর্পরাজ শিরোমণির, বড় বড়

গুরুরা সেই সর্পরাজের পায়ে পড়ে আছে। সাহস করে গেলাম সেই সর্পরাজের কাছে, গায়ে পড়ে বললাম, আপনি আমার বাপ, পথ-ঘাট হারাইছি, আপনি আমারে শিষ্য করে নেন। সর্পরাজ বলে, তুই বড় চালাক বেটা, আমারে বাপ দোহাই দিছিস, যা তোকে শিষ্য করলাম। অবশেষে তিনমাস তিনদিন গত হইলে আমি গুরু পাইলাম। গুরুর খোঁজ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা আমি। মন্দিরে খাই। মন্দিরে ঘুমাই। মানুষের পাশে ঘুমায় বড়বড় অজগর, শঙ্খনাগ, গুরুর সেবা করে সর্প ও মানুষ একসাথে। শিষ্য তো হইলাম, সর্পরাজের সেবা করি, পানি আনি, ছোটখাট কাজ করি, মন্দিরে ঘুমাই, কিন্তু সর্পরাজ কিছু শেখায় না। মনে মনে বলি, তুমি কেমন বাপ হইলা, আমারে কিছু শিখাও না। এইভাবে বছর যায়, এক বছরে আমি যে মান্নাফ সেই মান্নাফই থাকলাম। তন্ত্রমন্ত্র কিছুই শিখলাম না। মন তো আর মানে না। তখন একদিন ভোররাতে মন্দির থেকে পালাইলাম। পালাবো কোথায়, সর্পরাজের জাল সবখানে, এ রাস্তা ও রাস্তা, এ মাঠ ও মাঠ, এ বাজার ও বাজার করে সারাদিন হাঁটলাম, দৌড়াইলাম, শেষে সন্ধ্যায় চোখের সামনে দেখি, সেই একই মন্দির। সর্পরাজ তখন ডেকে পাঠায়, বলে– বেটা তুই কই গেছিলি? আমি বলি : বাবা তোমার অজানা কিছুই নাই, আমি ভুল করছি। প-াটফর্মের বাইরে বৃষ্টিটা একটু বাড়ে, তখন রাস্তার লোকজন প-াটফর্মে ওঠে। সর্পরাজের গল্পের মাঝখানে ঢুকে পড়ে তারা। কামরূপ-কামাখ্যার রহস্যময় জগতে তাদের মন উড়ে বেড়ায়। নিজের নিজের মতো করে সেই দেশের ছবি তৈরি করে। মাথা নেড়ে নেড়ে খানিকটা সন্দেহ মিশিয়ে তারা সর্পরাজের গল্প শোনে। এদের দুই একজন হয়তো কাজীপাড়া হাটে সর্পরাজের মজমায় আগের দিন ছিল। তারা ভাবে শুনি না কেন, এক গল্প দুইবার শুনলে অসুবিধা কী। বাকীরা যারা এই প্রথম শুনছে প্রথমে মজমায় আসতে পারেনি তারা মাঝখানে ঢুকেই শুনতে শুরু করেছে তারা গল্পের ফাঁকে ফাঁকে গল্পের ভাব অনুযায়ী আগের অংশটুকু নিজের মতো করে বানিয়ে নেয়। সর্পরাজ এবার তার বৃত্তে একটা চক্কর দেয়, তুড়ি বাজায়, তারপর ঠিক আগের জায়গায় এসে দাঁড়ায়।

গুরু একদিন এসে বলে, চল বেটা। আমি তো খুব খুশি। বছর গড়িয়ে শুরু আমাকে কই নিয়া যায়? নিজেকে জিজ্ঞেস করি। সেই আমি গুরুর পিছন পিছন চললাম। পাহাড়ের ঢাল, রাস্তাঘাট পার হয়ে পৌঁছলাম সর্পরাজের বাড়িতে। গুরুর বাড়ি হলো উঁচু মাচার উপর তৈরি, তার সাত মেয়ে। সাত মেয়েই জোয়ান। আমাকে পেয়ে সাত মেয়ে ঘিরে ধরলো, আমার দেশের কথা জিজ্ঞেস করলো। খুব খাতির যত্ন করলো। আশপাশের মেয়েরা ভিনদেশী ছেলে দেখার জন্য আসলো। গুরুর মেয়েরা হিংসা করে তাদের তাড়িয়ে দিলো। তিনদিন গেলে পরে গুরু বললো, চল বেটা। তখন গুরুর মেয়েরা বললো, আমাদের জুমে হাত লাগানোর লোক দরকার, ছেলেটারে রেখে যাও। গুরু বলে, রেখে গেলে উপকার হয়? মেয়েরা বলে, হয়। আমি ভাবি গুরুর মেয়েরাও তো শিকড়-বাকড়, তন্ত্রমন্ত্র জানে তারা নিশ্চয়ই আমাকে শেখাবে। এই ভেবে সেখানেই থেকে গেলাম। মেয়েদের সাথে পাহাড়ে কাজ করি। বাড়িতে

কাজ করি। কিন্তু তারা কিছুই শেখায় না। তখন একদিন কাজে না গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। সন্ধ্যায় গুরুর মেজমেয়ে আসে, সে বুঝতে পারে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। সে বলে, কি হইছে তোমার? আমি বলি, দূর দেশ থেকে আসলাম তন্ত্রমন্ত্র শিখতে, বছর চলে যায়। কিছুই শিখলাম না। মেজমেয়ে বলে তুমি সত্যিই তন্ত্রমন্ত্র শিখতে চাও? আমি বলি হা চাই। তখন সে বলে, আমি তোমাকে শিখাবো। তবে এক শর্ত। আমারে বিয়া করতে হবে। আমি ভাবি, মেজমেয়ের মন নরম, এত কিছুই করেও যখন কিছু হইলো না তখন তারে কথা দিলে যদি কিছু হয়। আর মেজমেয়েকে বিয়ে করলে শুরু হয়তো নিজেও উদ্যোগী হয়ে কিছু শেখাতে পারে। দেশ গ্রামে ফিরে গেলে মেয়ে-জামাই কিছু যেন করে মিলে খাইতে পারে। মেজমেয়ের ছোট কালো বা চোখ আমাকে ইশারা দেয়। আমি ওই আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ি। কথা দিলাম তাকে। সেজ মেয়ে তখন আমাকে তন্ত্রমন্ত্র শিখানো শুরু করলো। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে গাছ-গাছড়া চিনালো। শিকড় বাকড়ের ঔষধ বানানো শিখালো। আর শিখালো পেয়ার মহরতের দিশা। সেখানে হাজার কিসিমের গাছ ভাই। পৃথিবীতে হাজার হাজার রোগ দিছে আল-ায় আবার তারই কুদরত, হাজার হাজার গাছ-গাছড়াও দিছে সেই রোগের ঔষধ হিসাবে। এইখানে মানুষের কুদরত নাই। আল-াহ সাফি, আল-াহ কাফি! আল-াহ বরকত দিলে তবেই তো রোগ বালাই থেকে মুক্তি... না কি বলেন ভাই। এইবার একটা সর্প দেখেন, বাচ্চে লোগ তালিয়া বাজাও। বাচ্চা-কাচ্চারা তালি বাজাতে শুরু করলে তখন সর্পরাজ একটা বাক্সের ডালা খুলে তার সামনে ডান হাত দোলায়। তখন ফণা তুলে বেরিয়ে আসে কাল কেউটে। এইটা বড় বিষধর সাপ। গ্রামবাংলার খেত খামার, বন বাদাড় রাস্তা-ঘাটে থাকে। ফণা তুলে ঠোকর মারে। আপনারা বলবেন আমাকে কেন কামড়ায় না। আমি বলবো, ভাই এই যে দেখেন আমার হাতে আছে গাছের ছোট একটা টুকরা। এই যে দেখেন, এই গাছ হাতে থাকলে সাপ মাথা ঘুরিয়ে নেয়, কামড়ায় না। এই যে, এই দেখেন। সাপ শত্রু একবার, মানুষ শত্রু বারবার। উপায় জানলে শত্রুও মাথা নামিয়ে চলে যায়। উচিত ব্যবহার জানতে হয়। সাপেও কথা শোনে। চোরায় ধর্মের কাহিনী না শুনলে সাপ শোনে। এই যে এই দেখেন, এই সাপের মাথায় একটা খড়মের দাগ। সর্পরাজ সাপের গলায় ধরে বৃত্ত ঘুরে লোকজনকে দেখায়। এই দাগটা বড় পীর সাহেব আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল-াহ আলাইহের খড়মের। আপনারা বলবেন, ভাই এই সাপ খায় কী। আমি এরে কিছু খাওয়াই না। সাপ শত্রু একবার, মানুষ শত্রু বারবার। সাপ দেখে লোকজন এরে দুই চার টাকা করে দেয়। সেই টাকায় সাপের খাবার কিনি। ভাই, আমি সাপুড়িয়া না। সাপখেলা দেখাই না। আপনারা যে যা পারেন সাপের খাবার কেনার জন্য দেন, লোকজন আট আনা একটাকা করে ছুড়ে মারে। সর্পরাজ সেই টাকা কুড়িয়ে সাপসহ বাক্সের মধ্যে টাকা-পয়সা ঢুকিয়ে রাখে। কিন্তু বাক্সের ডালা বন্ধ করে না। সাপ কিন্তু বাইরে আসে না আর, টাকা-পয়সা নিয়ে বাক্সের ভেতরে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে। আপনারা জিজ্ঞেস করবেন, তবে কি আমি সাপের বিষ ঝাড়ি? হাঁ সাপের বিষ ঝাড়ি। কিন্তু সাপে

কামড়ানো রুগি ভালো করে বিনিময়ে কিছু নিতে গুরুর নিষেধ আছে। সাপ ধরে সাপে, কাঁটা রুগি ভালো করে জীবনে বহু সার্টিফিকেট পাইছি। তবে টাকা নেই না। সাপ ধরি, কিন্তু তিন জায়গায় সাপ ধরা নিষেধ শ্মশান, কবরস্থান আর গৃহস্থবাড়ি। সর্পরাজ তার ব্যাগ থেকে কিছু সার্টিফিকেট বের করে। শিক্ষিত ভাইরা দুই একটা হাত এগিয়ে দেন। এই যে দেখেন, এই সার্টিফিকেট দিয়েছে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে এক জিওসি মেজর জেনারেল আশরাফ। তার বাতের ব্যথা ভাল করেছিলাম। আর এই যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তার একটু গোপন অসুখ ছিল। এইখানে একজন যুগ্ম সচিবের সার্টিফিকেট, তার মেয়ের চোখ টেরা ছিল, বিয়া হইতে ছিল না, ঔষধ দিয়া ভাল করছিলাম। ঔষধে কী না হয়। এইখানে পাঁচশ সার্টিফিকেট আছে। সব সঙ্গে আনি নাই। বাসায় আছে আরো হাজারখানেক। বড় বড় লোকেরা উপকার পেয়ে খুশি মনে সার্টিফিকেট দিছে, খাতির করছে। সাপ ধরি, টাকা নেই না। বিষ ঝাড়ি, টাকা নেই না। তবে আমি পেট চালাই কেমনে? ঔষধ বেচি। বহু রোগ আছে ভাই। আমবাত, জ্বরবাত, গিটে গিটে বাত। দাউদ এগজিমা, চুলকানি। হজমের গোলমাল, পেটের পীড়া। আমার কাছে ঔষধ আছে। অল্প অল্প। লাগলে আওয়াজ দিবেন। লোকজনের সামনে লজ্জা লাগলে গোপনে বলবেন, ঔষধ দিয়া দেব। ভাই বন্ধু স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কিন্তু বাংলার বনে বাদাড়ের উপকারী গাছ আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। গাছের কুদরত অনেক। হেন কোনো রোগ নাই যা গাছে সারে না। অসুখ বিসুখ থাকলে আওয়াজ দিবেন। আমি তাবিজ বিক্রি করি না, সাপের বিষও আনি নাই। সাপ খেলা দেখাইতেও আসি নাই। আপনাদের জন্য আনছি বাংলার মূল্যবান গাছগাছড়া থেকে প্রস্তুত মূল্যবান ঔষধ। ঔষধের প্রসঙ্গ রেখে সর্পরাজ এবার অন্য প্রসঙ্গ যায়। এবার ছবি দেখেন। ব্যাগ থেকে পুরনো একটা অ্যালবাম বের করে সর্পরাজ। তার গুরুর ছবি দেখায়, এক সর্পসাধকের এক হাজার একটা সাপ খাওয়ার ছবি দেখায়, দেখায় গুরুর মেয়েও তার স্ত্রীর ছবি। আর এই ছবিটা দেখিয়েই সর্পরাজ ভুলটা করে বসে। সর্পরাজের কথাবার্তা গল্পের গল্পবিন্যাসের তন্ত্রজাল ছিন্ন হয়ে যায়। লোকজনের মনে পড়ে, সর্পরাজ তার গল্প শেষ করেনি। প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে ঔষধ বিক্রির কথা বলছে। ছোকরা টাইপের একজন বলে, গুরুর মেজমেয়েরেই আপনি বিয়া করলেন?

– হ, করলাম।

– তারপর কী হইলো?

– বউবাচ্চা নিয়া সাভারে চইলা আসলাম।

– তার আগে কী হইলো?

– গুরুর কাছে তন্ত্রমন্ত্র শিখলাম। দীক্ষা নিলাম।

মজমার লোকজন বুঝলো সর্পরাজ গল্প করতে চাচ্ছে না। সর্পরাজ লোকদের মজমায় জোর করে ডেকে আনেনি। আবার লোকজনও তাকে গল্প বলার জন্য ভাড়া করেনি। তবু যখন তারা বুঝতে পারে কোনোভাবে তাদের ঠকানো হচ্ছে তখন তারা

সর্পরাজের দোষ ধরতে আরম্ভ করে। লোকেরা গল্পের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করে। এদিকে সর্পরাজের শিল্পীমনে রোখ চাপে। নিজের গল্পকে যে আর বাড়াতে চায় না। সর্পরাজ বোঝে কোথাও গোলমাল ঘটে গেছে। কিন্তু, গোলমাল ঠেকাতে কোনো ছাড় দিতে তার মন সায় দেয় না। তখন এক সঙ্গে তিনটা ঘটনা ঘটে। ট্রেন আসার সংকেত হিসেবে স্টেশনের ঘণ্টা বাজে, অর্থাৎ ট্রেন আসার আর আধঘণ্টা কি পয়তালি-শ মিনিট, বড়জোর এক ঘণ্টাই বাকি থাকলো। বৃষ্টিটা ঝমঝম আওয়াজ তুলে বাড়তে লাগলো। ফলে, লোকজন আরও ঘন হয়ে দাঁড়ালো। কাজীপাড়ায় যাবার জন্য ট্রেন ধরতে আসা একজন বললো, পরশু কাজীপাড়া হাটেও তো গল্পটা শেষ করলেন না। লোকেরা বুঝলো, গল্পটা শেষ না করাই সর্পরাজের কৌশল। সারা বাংলাদেশের নানা জায়গা ঘুরে সর্পরাজ একই গল্প বলে, কিন্তু কোথাও গল্প শেষ করে না, গল্প ঘোরায়, ঘুরিয়ে এনে ঔষধ বিক্রির প্রসঙ্গ তোলে। ঔষধ বিক্রি করে লোক ঠকায়। মুরব্বী টাইপের একজন বলে, গল্প শেষ করেন সর্পরাজ। ধরেন, গল্পটা ধরেন, সমবেত লোকেরা বলে ওঠে। সর্পরাজ উপস্থিত বুদ্ধিতে পারদর্শী বলে, ভাইসব থামেন, কাজীপাড়ার লোকেরা কাজীপাড়া যাবেন, ট্রেনের ঘণ্টা পড়ছে, কেউ যাবেন শুকানদিহি, কেউ লালমনি। আমিও ট্রেন ধরব। ট্রেন আসার আগে ঔষধ নেন। আরেক দিন এসে গল্প শেষ করবো। সে বড় মজার আর অনেক বড় গল্প। আমার রুটিরুজির মামলা। কোনও ভাইয়ের ঔষধ লাগলে আওয়াজ দিবেন। কেউ আওয়াজ দেয় না। সাময়িক একটা নীরবতা নেমে আসে। কাজীপাড়ার একজন বলে বসে, ঔষধ পরে বিক্রি করেন, আগে গল্প শেষ করেন। দরকার হইলে এই ট্রেন ফেল করি, পরের ট্রেনে যাই। লোকজন হৈ হৈ করে তাকে সমর্থন করে। সর্পরাজ অভিমান করে, রাগ হয় তার। আবার একটা নীরবতা নেমে আসে। সর্পরাজ সার্টিফিকেট গোছাতে শুরু করে। অ্যালবামটা ব্যাগে ঢোকায়। ঘোরলাগা চোখ নিয়ে বসে থাকে। একজন বলে বসে– শালায় পালায় যে হে, ধর শালাক। ধর। অমনি কয়েকজন পিছনে ধাক্কা দিয়ে কয়েকজনকে সামনে ঠেলে দেয়। একটা হট্টগোল লেগে যায়। দু'একজন সর্পরাজকে মারতে যায়। মারেও। কেউ যায় ঠেকাতে। ধীরে ধীরে মারতেই থাকে সকলে, মারার ভাগটা প্রবল হয়ে ওঠে, ঠেকাবার ভাগটার চেয়ে। মার খেয়েও সর্পরাজ আওয়াজ করে না। মার খেতে খেতেও ভোলে না সে সর্পরাজ। তার এই নির্বাক ভঙ্গিতে লোকজন আরো ক্ষেপে ওঠে। মারতে মারতে তাকে প-াটফর্মের বাইরে বৃষ্টিতে নিয়ে আসে। রেললাইনের পাশে শুইয়ে দেয়। একজন প-াটফর্ম থেকে সাপের বাক্স, অ্যালবাম ছুঁড়ে মারে বৃষ্টিতে। অমনি খোলা বাক্স থেকে কেউটে সাপটা ফোঁস করে ছোবল তুলে বেরিয়ে আসে। মুহূর্তেই লোকগুলো সরে যায়। ট্রেন আসে। গল্পের নেশা চাপা লোকগুলো অসমাপ্ত গল্পের সর্পরাজের গল্প করতে করতে ট্রেনে ওঠে। পাশ্ববর্তী লোকেরাও সে গল্প শুনে সর্পরাজকে দোষ দেয় একবার, একবার গল্পপাগল লোকগুলোকে। ট্রেন চলে গেলে ফাঁকা স্টেশনে বৃষ্টির মধ্যে শুয়ে থাকতে দেখা যায় সর্পরাজকে। দেহটা রক্তাক্ত। কাল কেউটে ফণা তুলে পাহারা দিচ্ছে তাকে। বৃষ্টি

পড়ছে ফণায়, সর্পরাজের শরীরে। কিছু পয়সা পড়ে আছে, দু'তিনটা একটাকা, দুইটাকার নোট। সর্পরাজকে বাঁচাবার জন্যও কেউ যাচ্ছে না আর, মারা তো দূরের কথা। কেউটেটার ভয়ে। সর্পরাজও হয়তো সুযোগ বুঝে ঘাপটি মেরে আছে। স্টেশন আরো ফাঁকা হলে সে উঠে বসে বাক্সগুলো গোছাবে, তার ব্যাগ ও ভেজা অ্যালবাম গোছাবে... প্রিয় কেউটে, টাকা-পয়সা এবং অসমাপ্ত গল্পগুলো নিয়ে আবার রওয়ানা হবে আরো দূরের, অনেক দূরের হাটে। যেখানে কাজীপাড়ার হাটের লোকের সাথে শ্রীপতিপুরের হাটের লোকের মিলমিশ নাই। শুকানদিহি আর বারিগাঁও আলাদা আলাদা পড়ে থাকে। সেইখানে। আর সুকৌশলে অসমাপ্ত গল্প বলে বলে নিজে নিজেই হাসবে। আপন মনে বলবে লোগুলো বোকা, সহজ সরল। গল্প শুনতে ভালোবাসে।

সহজ শিশুশিক্ষা ও আমাদের অধিকৈশোর

ভাইয়ের নাম বিশু, আমার নাম জিটি। বয়সে ছোট হলেও সে জিটি বলেই ডাকে আমাকে। পাড়ার দশজনেও জিটি বলে, নুরেসলাম না বলে। আমি হলাম চুপচাপ, রক্তচোষা জাতের। দিনে রাতে নড়াচড়া করি কম। শরীরের খাঁজে ফাঁকে-ফোকরে কুড়েমিতে ভরা। নিজের মাঝে গুম হয়ে বসে থাকি। লোকে সেজন্য জিটি কুড়িয়া বলেও ডাকে। বিশু চলে ঠিক উল্টা চালে। হৈ-হল-া করে। ছেলেপেলেদের সাথে পাল-া দিয়ে টিলাউ টিলাউ করে পাড়া-বেপাড়া ঘুরে বেড়ায়। গোপনে পয়সা খেলে। মার্বেলের মৌসুমে মার্বেল খেলে। বর্ষাশেষে খানা-খন্দরে জমে থাকা পানিতে মাছ ধরে। হায়ানদের সাথে ঘুরতে ফিরতে যায়। হায়ান আমাদের থেকে অনেক বড় হলেও আকারে প্রকারে তখনো আমাদের সমান সমান। তার বয়সের হিসাব করা সহজ না। কারণ বয়সের সাথে তাল দিয়ে শরীর বাড়েনি তার। আমাদের মায়ের বিয়ের সময় সে রীতিমতো হেঁটে বেড়ায়। আর মায়ের বিয়ের দেড় বছর পর আমার জন্ম। আমার দেড় বছর পর বিশু। সম্পর্কে আমাদের পাড়াতুতো চাচা। তবু চাচা বলি না তাকে। আবু রায়হানও বলি না। বরং বন্ধু ভেবে হায়ান বলেই ডাকি। মাথাভরা বুদ্ধি ওর। আমি তাই ভিতরে ভিতরে হিংসা করি ওকে। আর বিশু সারাক্ষণ হায়ানের গায়ে গায়ে লেগে থাকে। কাঁঠালের সময় কখনো দুপুর কি বিকালে ফড়িং-এর ওড়াওড়িতে আকাশ ভরে যায়। ফড়িং-এর দঙ্গল হায়ানদের সব্জিক্ষেত ছেঁকে ধরে। তখন হায়ানের বাপ স্যান্ডোগেঞ্জি ঘাড়ে করে বাড়ি থেকে বের হয়। কাল বিকাল নাগাদ বৃষ্টি হবে কি না সেই কথা বলে। আর হায়ান সিণ্ডার মাথায় কাঁঠালের আঠা জড়িয়ে বিশুদের হাতে একটা করে সিণ্ডা ধরিয়ে দেয়। তারপর সকলে একত্রে ঘাস ফড়িং-এর পেছনে ছোটে। গ্রামে পাটকাঠিকেই সিণ্ডা বলি সকলে। আমাকেও কখনও কখনো চুপচাপ বসে থাকতে দেখলে হায়ান একটা সিণ্ডা দিয়ে যায়। আমি বসে বসেই সেটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে থাকি। দৈবাৎ যদি কোনো ফড়িংয়ের এসে বসে। বিশুরা পা টিপে টিপে ফড়িং-এর খুব কাছে যায়। আর হাজার-চোখা ফড়িং গায়ে সিণ্ডার মাথা ছোঁয়াবার আগেই উড়াল দেয়। তখন আরেকটা ফড়িং-এর দিকে মনোযোগ দেয় তারা। এইভাবে সমস্ত দুপুর চলে যায়।

হায়ানদের ছিল এক মস্ত দোফসলা জমি। সকলে জমিটাকে ষোলদোন বলে।

কারণ ঐ জমির মাপ ষোল দোন। হায়ান তার ভাইদের নিয়ে সকাল সকাল ষোলদোনে যায়। পাটক্ষেতে নিড়ানি দেয়। কেশুর তোলে। আর ফেরার পথে বাড়ির জন্য পাটশাক তুলে আনে। আমাদের দুই ভাইয়ের জন্য ক্ষেতে-খামারে ঘোরা নিষেধ। আমরা কালো হয়ে গেলে মা আবার খুব চিন্তা করে। আমি তাই সাবধানে ছায়ায় ছায়ায় ঘুরি। বিশু কিন্তু গোপনে ষোলদোন যায়। দুপুরের রোদে হায়ানদের সাথে কেশুর তোলে। আমার কাজ হলো মাকে এইসব বলা। মা তখন বাপকে বলবে। বাপ কাজেকর্মে ফাঁক পেলে বিশুকে পেটাবে। তখন চার-পাঁচ দিনের জন্য বিশুর সঙ্গে আমার শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। বিশুর জ্বালায় আমার তিষ্ঠানো দায় হবে। কেশুর তোলা কিন্তু বড় ঝক্কির কাজ। একদিন গোপনে মকেচ জাদুর সাথে কেশুর তুলতে গিয়ে দেখি– ছয় আঙ্গুল কাঁকুড়ের ছয় হাত বিচি। গাছ দেখতে ঘাসের সমান– আকারে চার আঙ্গুল। তার শিকড় আবার হাতকে হাত। খুঁড়তে থাকলে শুধু বাড়তেই থাকে, সোজা মাটির গভীরে। অন্যমনস্ক হলেই কাটা পড়ে। তখন ঘাসের আর কেশুরের শিকড়ে তফাৎ করা খুব কঠিন। আমাদের বেলা বারবার এরকম হতে থাকলে মকেচ জাদু থেকে থেকে হাত বদলায়। জিহ্বায় শব্দ তুলে বলে 'থও পাওয়া যায় না বেহে'। দৈবাৎ যদি থও পাওয়া যায় তো শিকড়ের মাথায় থাকে কালো রঙের সাদা শাঁসঅ'লা মিষ্টি কেশুর। তখন পাসুন দিয়ে কেশুর ছুলতে ছুলতে মকেচ জাদু সালেক হাজির মেয়েদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় কেমন দেখায় সে কথা বলে। বোবা মেয়েটিকে তার কাছে গছিয়ে দিয়ে তাকে ঘরজামাই বানাবার ফন্দিফিকির ফাঁস করে দেয়। তালে তালে জিজ্ঞেস করে নেয় 'তোমার হোলের মণি ফুটচে?' তখন আমরা হোল বললে লজ্জা পাই, ভোচো বলি। মকেচ জাদুকে সংশয়ে মাথা নিচু করে 'ফোটে নাই' বলি। মকেচ জাদু দেখতে চাইলে লজ্জা পাই। তবু দেখাই, মণি না ফোটার সমাধান যদি দিতে পারে। দেখেশুনে অভয় দেয় সে। শ্যালো মেশিনের কাছ থেকে পরিষ্কার বালু এনে মণির গোড়ায় দিতে হবে। আমি বুঝি, কেশুর তোলা কত ঝক্কির কাজ। বেশি কথা বললে হয় না। বিশু কিন্তু হায়ানের বুদ্ধির জোরে ষোলটা কেশুর নিয়ে ফেরে। সেদিকে লোভ করি না মোটেও। বরং রক্তচোষা জিটির মতো বিশুর ভেজা চুল শুকে দেখি। বিশু জানে তার শ্যালোর পানিতে গোসল করা, ষোলদোনা ঘোরা এইভাবে বুঝতে পারি আমি। ভাল ছেলের মতো পাঁচটা কেশুর গুণে গুণে দেয় সে আমাকে। আর বাপের আসার সময় হলে তড়িঘড়ি বাড়ি ফেরে, পাটি বিছিয়ে পড়তে বসে। বাপ আমাদের ব্যবসাপাতি করে আর মুখ ব্যাজার করে সাইকেল চালায়। খুশি হয় শুধু আমাদের পড়তে দেখলে।

আমাদের চোখের সামনে হায়ানরা একে একে আট ভাইয়ে দাঁড়ালে আমরা দুই ভাই মিলে ভাবনা করি। আমাদের ছোটভাই নেই বলে হায়ানের ভাইদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। বছর বছর জন্ম নেয়া ভাইগুলো অপরিষ্কার মুখ নিয়ে আমাদের দিকে উগ্‌গু দিয়ে ওঠে। হায়ানের বাপও এইসব নিয়ে ভাবে না। তছির দাদা বলে ডাকি তাকে। সে চালাকের উপরে এক কাঠি। চালাকের হাড্ডি। গ্রামশুদ্ধো

লোককে লালবাগের হাটে সাতবার বিক্রি করে আসতে পারে। শীতের দিনে সকাল সকাল বাপ খেয়ে দেয়ে ব্যবসা দেখতে যায়। বিশু আর আমি চুলার ধারে গুনুর গুনুর করে পড়ালেখা করি। বাপ চলে গেলেই মা আমাদেরকে খেতে দেয়। খেতে দিয়ে সংসারের জন্য এটা সেটা করতে যায়, কাজের তালে তালে আমাদের কথা আর মনে থাকে না। সেই ফাঁকে তছির দাদার উঠানে উড়াল দেই। মাটির ঘর বানাবার জন্য লাল মাটি এনে তছির দাদা যে ঢিবি বানিয়েছে তাতে বসে সকালের রোদ খাই। আর হায়ানের বাপের মুখে মুখে বানানো শেয়াল পণ্ডিতের গল্প গিলে খাই। হায়ানদের দুই ভাই ঝগড়া করে এক ভাই তার কাছে আসে। তছির দাদা বলে, বড় ভাই হিসেবে সে যেন ছোটটাকে আচ্ছা পিটান দেয়। পরক্ষণে ছোটটি যখন বলে বড়টা তাকে মারার জন্য খুঁজছে তখন আবার তাকে বলে 'বারোদোনের দিকে দে দৌড়'। তার এই চালাকিতে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। হায়ানের কথা ভাবি। বাপের বুদ্ধির ধার পেয়েছে সে। আমাদের বাপের বুদ্ধির বদলে আছে ব্যবসা। বাপও মহাসেয়ানা। ব্যবসা শেখায় না। খালি পড়তে বলে। পড়লে আরো পড়া এনে দেয়। দরকার হলে মাস্টার রেখে পড়াতে চায়। হায়ানের বাপ বসে বসে ষোলদোনের জমিটা বাড়াবার ফন্দি করে। বুদ্ধি নিতে আসা লোকদের বুদ্ধি দেবার ফাঁকে নিজের ফন্দিও সফল করার পাঁয়তারা করে। বউ পেটানো, পরের মেয়ের গায়ে হাত দেয়া, চুরিচামারি, জমিজমার মামলায় লোকজন তার কাছে বুদ্ধি নিতে আসে। তছির দাদা আইনের ধারা বলে। উকিল মোক্তারের খোঁজ বলে। শহরে দুদু উকিল, বাশার উকিল, সোবান মোক্তারের সাথে দেখা করার পথ বাতলে দেয়। আর ফাঁক পেলে বলে 'গাহাক থাকেতো থলে-র বানের জমিটা বেচাই'। এই হলো তার ষোলদোন বাড়াবার ধান্দা। নতুন করে জমি না কিনে খণ্ড খণ্ড জমি বিক্রি করে ষোলদোনের লাগোয়া জমি কেনার ব্যবস্থা করা। এইভাবে জমি বড় করতেই তার বছর চলে যায়। আট আটটা ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেও ভাবে না। শেষমেষ তাদের জমি এসে ঠেকলো দু'টায়। ষোলদোন আর বাড়িভিটা। ষোলদোন দোফসলী জমি। হয় ধান কেটে পাট, না হয় ধান কেটে ধান লাগাতে হয়। আর বাড়িভিটায় সারা বছর আলু, মরিচ, বাঁধাকপি, টমেটো, পেঁয়াজ, লাউ, মেটে কুমড়া আবাদ করে। হায়ানরা সাত ভাই এই দুই জমির পিছনেই খাটে। কোলের ভাইটা তখন মায়ের কোলে দুধ খায় আর আমাদের দেখে উগণ্ড দিয়ে ওঠে। তছির দাদা আমাদেরকে শেয়াল পণ্ডিতের গল্প বলে। সেই যে বোকা কুমির– সে তো জানে না একটা বাচ্চাই তার শেষমেষ বেঁচে-বর্তে আছে। কুমির ভাবে, বাছারা আমার এই বয়সেই কষ্টে-সৃষ্টে লেখাপড়া শিখে নাও। বড় হলে ডাক্তার হবে। মাঝে মাঝে জড়ো হওয়া মেয়েদের দিকে তাকিয়ে রসাত্মক বাক্য ছাড়ে তছির দাদা। নিজের জমির দিকে ইঙ্গিত করে বলে 'ক্যায়ছা ফুটবলের মাঠ বানাছি দ্যাখো'।

ইরি মৌসুম এলে হায়ানদের কাজ বেড়ে যায়। তখন ষোলদোনেই রাত কাটায় চার ভাই। হাট থেকে ডিজেল কিনে ইরিক্ষেতে পানি নেয় রাতভর। দিনের বেলা

নিড়ানি দেয়। আর বাপ বেটা নয় ভাই বৃষ্টির চিন্তা করে। রাতে দুই ভাইকে রেখে দুই ভাই খেতে আসে। আবার ভাত বেঁধে নিয়ে যায় অপর দু'জনের জন্য। আমাদের তখন লিখে পড়ে কাজ নাই তো ভূতে কিলায়। ভূতে বিশ্বাস করি। ভূতের কথা কেতাবে নাই। তছির দাদা বলে, জ্বীন-পরির কথা আছে অবশ্য। ষোলদোনের খানিক দূরে ফতেপুর-মাধবপুরের মোড়ে ছয়ছয়টা বট-পাকুড়। জ্বীন পরিদের নিবাস। চিকনদিহির হামিদ ডাক্তার বলে এইসব। ওই মোড় হয়েই প্রতিরাতে চিকনদিহি যায় সে। পাইলচারা বাজারে হোমিওপ্যাথির ডিসপেন্সারি তার। তবু মন দিয়ে ডাক্তারি করে না। সারাদিন জয়রাম, ভেলু, শুকানদীঘি, উয়ারপাড়, ময়নাকাঁটা ঘুরে ঘুরে জ্বীন পরি তাড়িয়ে বেড়ায়। এই নিয়ে এলাকার জ্বীনেরা তার উপর মহাবিরক্ত। ফতেপুর মোড়ে জোট হয়ে রাত-বিরাতে শাসায় তাকে। কিন্তু গা বন্ধ করে থাকে বলে মারতে পারে না। ইরি, আউশ মৌসুমে এইসব নিয়ে ভেবে আমাদের শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হায়ানদের কী হয় এই নিয়ে তটস্থ থাকি। সন্ধ্যার পর খেয়েদেয়ে হায়ানদের দু'ভাই ভাত নিতে এলে মাঝে মাঝে আমাদের দেখা পায়। তখন পাথার জুড়ে থাকা চোরচাট্টা, মেয়েমানুষ আর জ্বীন-পরির গল্প বলে। একেক সময় নাকি পরি আর মেয়েমানুষে ফারাক করা যায় না। দূরের শ্যালো মেশিনে মেয়েমানুষের আবছায়া দেখা যায়। পরক্ষণেই আবার নাই হয়ে যায়। শ্যালোর ঝুপড়িতে বাতি নিভে যায়। আবার আলোর দুই হাত উপর দিয়ে শূন্যে শূন্যে হেঁটে বেড়ায় পরি একটা দুইটা। তখন আমাদের ভয় হয়। বিশুকে চুপেচাপে বলি, ভূত বুঝি হায়ানের দুই ভাই সেজে আমাদের কাছে নিজেদের গল্প বলে গেল। হায়ানদের চলে যেতে দেখলে তাদের হাঁটা লক্ষ করি। মাটির উপর পা না ফেলে হাঁটে কিনা। কখনো কখনো তারা পাথারে চোরদের উৎপাতের কথা বলে। চোরেরা হন্যে হয়ে সারা মাঠ ঘোরে। সকলের নাম ধরে ডেকে ডেকে খবর নেয়। খানিক গল্প করে। বলে, এবার চুরিচাট্টা নাই। দৈবাৎ কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলে সাবধানে ডাকে দুই তিনবার। সাড়া না পেলে ধানের আঁটি, এটাওটা সরায়।

ধানের মৌসুম শেষ হলে পাড়াজুড়ে ডুগডুগি বাজিয়ে কটকটি, চমচম, বাদাম, বুট, রূপচর্চার দ্রব্য, গ্লে, পাউডার ফেরি করে বেড়ানো শুরু হয়। অনেককে ভূতে ধরে। আর অমাবস্যায় চোরের প্রকোপ বাড়ে। হায়নরা মিস্ত্রিটারি, বশরিবাড়ি আর জয়রামের ছেলেদের সাথে ফুটবল, হা-ডু ডু খেলা দিয়ে বেড়ায়। এইসবে মন থাকে না আমার। আমতলায় বসে হাঁটু গেড়ে আমি অকেজো বুড়োদের গল্প শুনি। কখনো মাটিতে দাগ কেটে পাইত পাইত খেলতে বসা বুড়োদের খেলা দেখি। বাপ রাগ করে। বলে, বুড়োদের অকেজো গল্প শুনে লাভ নাই।

আমতলায় একদিন হিন্দুপাড়ার মজি চোর আসে। লম্বা চওড়া, দাড়িঅ'লা মজি চোরকে দেখে বুড়োরা রসাত্মক হাসি দেয়। পাইত খেলতে বসা লোকেরা খেলা রেখে তার দিকে মনোযোগ দেয়। 'শেষা বউটাক কোনটে থুয়া আইনেন ভাতিজা?' একজন তাকে উদ্দেশ্য করে বলে। 'লালমণি।' উত্তর করে সে। এলাকার আশপাশে চুরি করে

না বরং দুইচার থানা দূরে তার চুরির গণ্ডি। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, ভুরুঙ্গামারি, হাতিবান্ধা এলাকায় চুরি করতে যায়। চুরিচাট্টা করে গ্রামে ফেরে না। ফরিদপুর কি অভয়নগরে গিয়ে কোনো গেরস্থর মেয়ে বিয়ে করে বাড়ি ফেরে। এই করে করে তার ঊনপঞ্চাশটা বউ। ছেলেপেলের হিসাব নিজেও জানে না। একটা নতুন বউ অবশ্য সব সময় নিজের সঙ্গে থাকে। বাকীরা কেউ বাপের বাড়িতে, কেউ উচাভিটায়, কেউ লালমণি, কেউ উলিপুরে থাকে। তারপরেও গ্রামে এলে মজি চোর হিন্দুপাড়ার মেয়েদের জ্বালাতন করে। আর বুড়োদেরকে বলে, সঙ্গের চোরদের সে বলে দিয়েছে, এই গ্রামে আর চুরি হবে না। বুড়োরা সোজা মনে তার কথা বিশ্বাস করে। তখন চুরির নিয়মকানুন বলে মজিচোর। কীভাবে গেরস্থ বউদের কুপির আলোর ছায়ায় ছায়ায় ঘরে ঢুকে চকির নিচে লুকিয়ে থাকে তারা আর মাঝরাতে ঘর সাফ করে দেয়।

বাড়ি এসে এইসব মাকে বলি আমি। মায়ের ভয় ধরে যায়। সেদিন থেকে সে শোয়ার আগে চকির নিচে দেখতে শুরু করে। আর অমাবস্যার রাতে উঠানে ঝাড়ু পর্যন্ত ফেলে রাখে না। অমাবস্যায় চুরি যাওয়া গেরস্থর জন্য অমঙ্গলজনক। আর চোরদেরও দিব্যি নেয়া থাকে এই দিন কিছু না কিছু চুরি করতেই হবে। নইলে সারা বছর ফাঁকা যাবে। এসব মজি চোরের কাছে শোনা কথা।

আমাদের চেয়ে আকারে প্রকারে বড় কিছু ছেলে ছিল পাড়ায়। স্কুলের ময়দানে কাঁচামিঠা আম পুষ্ট হবার আগে তারা খেয়ে ফেলতো। শহরে গিয়ে 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' কি 'কমলার বনবাস' দেখে আসতো। মেয়েদের নিয়ে অল্পস্বল্প গোপন কথা বলতো। আর উঁচু-উঁচু তাল গাছ, চাগুয়ার গাছে উঠে ধানশালিকের বাচ্চা পেড়ে আনতো। এইসব কাজের বেলায় বড় হলে আমরা কী করবো তা এদের কাছ থেকেই শেখা। এদের মাঝে থেকে কেউ কেউ আবার তুলা রাশি, পাতা হবার যোগ্য ছেলে বেরিয়ে আসে। চৈত্রের দুপুরে এদের নিয়ে চিকনদিহি, পাইলচারা, জয়রাম, ময়নাকুড়ি জুড়ে পাতা খেলা চলে। পাইলচারা হাটে বাইসকোপ এলে এদের একজন দু'জন বাইসকোপঅলাদের কাছাকাছি চলে যায়। সাপুড়িয়া এলে তার হাত থেকে সাপ নিয়ে দাঁত পরীক্ষা করে। বিশু, হায়ান এদের সাথে শুকানদীঘি, উয়ারপাড় গিয়ে শাদা মশানধরা এক লোককে দেখে আসে। বুড়োরা এদের বকাসকা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। কারণ এদের নাই কাজ তো খই ভাজ। একটু কাছে পেলে তিরস্কার করে। আমার মতো সুস্থিরভাবে চলতে উপদেশ দেয়। আমি আড়ষ্ট হয়ে যাই তখন। কারণ এভাবেই সবাই আমার শত্রু হয়ে গেল। আমাকে মিথ্যাবাদী বলে তো বলেই, হা-ডু-ডু খেলার পয়েন্ট গোণার জন্যেও ডাকে না আর। খাট্টাস, জিটি বলে বলে খেপায়। আমি কিছু বলি না। শয়তানের মতো মুখ করে হাড় টাটানো হাসি দেই। ওদের হাড় জ্বলে যায়। আরও বেশি করে গালি দেয় আমাকে। বাপ অবশ্য নিষেধ করে এইসব ছেলেদের সাথে মিশতে। বাপ তো ভাল করেই জানে এরা খারাপ খারাপ কথা শেখায়। তাই ওদের সাথে কথা বলতে দেখলেই ডেকে পাঠায়। মাথার চুল একটু বড় হলেই দুই ভাইয়ের হাতে দুই টাকা ধরে দিয়ে চুল কাটিয়ে আসতে

বলে। পাইলচারা হাটে সোজা অনিলদা'র সেলুনে চলে যাই। বেঞ্চে বসে আমাদের সিরিয়ালের জন্য অপেক্ষা করি। অনিলদার ঘর জুড়ে সাঁটা ইন্দিরা গান্ধী, শেখ মুজিব, হাতির মুখঅলা গণেশ, শ্রীচৈতন্য, ববিতা, রেখা, আতাউল গণি ওসমানির ছবি দেখতে দেখতে আমাদের সময় চলে যায়। মমতাজ হাজাম অনিলদা'র দোকানে আসে। মমতাজ হাজামরা বংশপরম্পরায় আমাদের মুসলমানি আর জন্মানোর পর মাথা কামানোর জন্য দায়িত্ব পেয়েছে। হাজামের বাপ আমাদের বাপের মুসলমানি করিয়েছে। হাজাম করাবে আমাদের। তাই হাজমকে দেখলেই ভয় পাই আমরা। অনিলদা'র দোকান একটু ফাঁকা হলেই হাজাম আমাদের মণি দেখতে চায়। আমরা লজ্জা পেলে সে বাপ বাপ বলে আদর করে। মণি দেখে বলে, সময় হয়ে গেছে। 'তোমার বাপক কওয়া লাগে।' তখন আমাদের মুখে ভয় ফোটে। হাজাম আমাদেরকে অভয় দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টায়। বলে, 'তোমরা কি সারাদিন কাজিয়া করেন না কি বাপ'? এসব লোকজনের কাছে শোনা কথা– একই ক্ষুরে আতুর চুল কামালে নাকি ভাইয়ে ভাইয়ে খুব ঝগড়াঝাটি হয়। মমতাজ হাজাম একই ক্ষুরে বিশু আর আমার আতুর চুল কামিয়েছে। অনিলদা'র দোকান হতে সোজা পাইলচারা বাজারের মাঝের ইন্দিরায় চলে যাই। ইন্দিরার অর্ধেকটা পাকুড়ের চারায় ভরা। তার নিচে গোলাকার স্বচ্ছ জল। সেখানে কমলা রঙের নাইলোটিকা মাছ তিনটা। মাছগুলো আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। একবার ডোবে, বহুক্ষণ পর আবার ওঠে। উঠলেই 'হাহ্' বলে একটা প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করি ইন্দারায়, অমনি ডুবে যায়। মাছ দেখতে দেখতে বাপের কথা মনে থাকে না। সূর্য পশ্চিমে হেলে ছায়া পড়লে আমরা হেলতে দুলতে বাড়ি ফিরি। আমাদের সেয়ানা বাপ চেহারার দিকে দৃষ্টি ফেলে বলে, চুল কাটাতে কতো সময় লাগে? আমরা উত্তর না দিয়ে কাচুমাচু করে গোসল করে পাটি বিছিয়ে পড়তে বসি। এইটা হলেই বাপ মহাখুশি। বাইসাইকেল বের করে মহাআনন্দে ব্যবসা করতে যায়। গায়ের রঙটাও আমরা বাপের কাছ থেকে পাই নাই। আমরা মায়ের মতো কালো। এই নিয়ে মাও সুখ পায় না, বাপও না। খুব খেয়াল রাখে রোদে রোদে না ঘুরি যেন। বাপ চায় তার মতো সাদা ফকফকা দেখাক আমাদেরকে।

এরপরও কোথায় যে ছুট না দেয় বিশু সে কথা হায়ান ছাড়া কে জানে। হায়ান এসে আমাকে তাদের হল-ার নানান কথা বলে। বিশুও বলে। কারণ গল্প শোনার জন্য সবসময় এই এক জিটি কুড়িয়া একাই প্রস্তুত। যতোক্ষণ শুনি ততোক্ষণ খুবই ভাল। বলতে গেলেই মিথ্যাবাদী। তাই বলা যতো কমিয়ে দিলাম ততোই জনপ্রিয় হতে থাকলাম আমি।

হায়ানরা একদিন 'জটি হে, হাঁটো পাতা বানা দেকি আসি' বলে। জমজমাট পাতাখেলা সামনে রেখে পাতা বানানোর আয়োজন। তুলা রাশির ছেলেদেরকে মাটির উপর কাঁসার বাটিতে হাত রাখতে দিয়ে গোল করে বসানো হয়। মাঝখানে নরেশ গুণীন পাতা টানে। মন্ত্র আওড়ায়। মন্ত্রে মন্ত্রে আসল তুলারাশি কাঁসার বাটিসহ আপনা আপনি চলতে থাকে। চলতে থাকলে সেই তুলা রাশি হয় পাতা। আর গুণীন

তাকে সারা উঠান ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। পাতাবাছা শেষ হলে এক দুইদিন পর হঠাৎ বুড়োদের গল্পগাছা শুনতে শুনতে দেখি আইজালের ছেলে ইদু প্রাণপণে পাইলচারা হাটের মাঠ দিয়ে মাধবপুর-ফতেপুর মোড়ের দিকে ছুটছে। বুড়োরা 'শুরু হইল হে, পাতাখেলা' বলে আমাদেরকে উসকে দেয় পাতা কোনদিকে যায় সেটা দেখে আসার জন্য। ততোক্ষণে ইদু বহু দূরে চলে গেছে। হয়তো ফতেপুর-মাধবপুর মোড় ছেড়ে চিকনদিহির দিকে। পাইলছাড়া হাটের লোকজনের মুখে এই আভাস শুনি। লোকজন বলে, 'হামিদ ডাক্তার বাড়িত বসি পাতা টানোচে'। আরেকজন বলে– কিছুদূর এগিয়ে পাতা ঘুরে উল্টা দিকে ময়নাকুড়ি মুখে ছুটে গেছে নাকি। বকর পাগলা ময়নাকুড়ি বাজারে বসে বসে পাতা টানছে। ভিড়ের মধ্যে হায়ান ফিসফিস করে– 'জিটি, হিন্দুটারি যাইমেন'। হিন্দুপাড়া থেকে পাতা ছাড়ে নরেশ গুণীন। অল্পবয়সী ছেলেদের কখনো মাঝবয়সীদের গায়ে শিং-মাগুরের কাঁটা ফুটিয়ে তীব্র বিষে জর্জরিত করে। তারপর মদ তাড়ি খাইয়ে দিলে রাস্তার মোড়ে কল-াকাটা মাছের মতো তড়পায় পাতারা। নানা দিক থেকে বান মেরে তাদেরকে টানতে থাকে হামিদ ডাক্তার, বকর পাগলা, ছট্টু মুন্সী, নুরু কবরেজ– চিকনদিহি, ময়নাকুড়ি, উয়ারপাড়, পশ্চিমপাড়া থেকে। মোড়ে মোড়ে পাতাদের তড়পানো দেখতে লোক জমে যায়। ছোটরা পিছিয়ে পড়ে। লম্বা চওড়া লোকেরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। হায়ান আর আমি পিছাতে থাকি। হায়ানকে জিজ্ঞেস করি একসময়– 'পাতা টানতে টানতে শেষত কী হইবে হায়ান'। হায়ান উত্তর দেয় না। তাকিয়ে দেখি ভিড়ের রোলে হাওয়া হয়ে গেছে।

এমনি করে জ্বিন, ভূত, পাতাখেলা, চোরচাট্টা, তুকতাক, সাপখেলা, বাইসকোপ দেখতে দেখতে বড় হই খানিক। বাপ আমাদের কোলেস্টরে আলু রেখে একবার লস খায় তো একবার লাখ খায়। রাতে কুমিল-ার ফলের টনিক বিক্রেতা ক্রেতাদের মাইকে ধন্যবাদ জানানোর পরও পড়াশোনা করি। হায়ানরা 'বৌদির সাথে দেবরের প্রেমলীলা' কিনে আনে। ময়দানের আমগাছে উঠে পদ্যে লেখা বইটি সুর করে পড়তে থাকে। আমি গাছে উঠতে না পেরে ময়দানের ঘাসে বসে তড়পাই। এক জ্বিনের আছরে অবির নাউয়া মারা যায়। মকর হাজির আমলির গাছে বাস করে জ্বিনটা। সবাইকে শাসায়। লোকজন ভয় পেয়ে আমলির গাছের নিচে ধূপধূনা জ্বালিয়ে জ্বিনকে দুধের ভোগ দেয়। জ্বিন করে কি, কালকুচকুচে সাপ সেজে এসে দুধ খেয়ে চলে যায়। এইসব দেখে মাকে বললে মা বাপকে নালিশ দেয়। বাপ আমাদেরকে চড়চাপড় মেরে বাজার থেকে হামিদ ডাক্তারকে ডেকে আনে। ডাক্তার দোয়াদরুদ পড়ে আমাদের শরীর বন্ধ করে দেয়। বাপ বলে, আজ থেকে যেন এইসব কায়কারবারে সময় নষ্ট করতে জিটি-বিশু কাউকেই না দেখে সে। দেখলে দুঃখ আছে কপালে। বাপের শাসানি খেয়ে তিনদিন চুপচাপ থাকি আমরা। আবার পালাবার জন্য ছোগবোগ করি। পঞ্চম দিনে বাপ আলুর বাজার পরখ করতে হাটে গেলে আর মা ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকলে আমরা আবার আমাদের কৈশোরের অনির্ণিত অন্ধকারের দিকে বেরিয়ে পড়ি।

এরই মাঝে ছেলেপেলেদের ভেতর আমার চুপচাপ থাকার বাতিক খানিক আমল পেয়েছে। কথা বলি কম। যা বলি সব ঘোষণা করে মিথ্যাই বলি। তছির দাদা আর অন্যান্য বুড়োর কাছ থেকে শোনা গল্প হাতে রেখে রেখে অল্পস্বল্প শোনাই ছেলেদেরকে। আমার একাকীত্ব ঘুচতে থাকে। সোবান জুটে যায় আমার সাথে। হায়ানের সঙ্গে যেমন বিশু জুটে গেছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে সোবান ফিসফিস করে। বলে, 'দুইটা টাকা নিয়া আয়।'

'ক্যান'?

'আরে নিয়া আয় না আগত।'

ছুটে গিয়ে জমানো দুই টাকা নিয়ে আসি। ওই দুই টাকাই ছিল হারেছদার কাছে ইস্কুলের সময় আইসক্রিম খাওয়ার জন্য। টাকা নিয়ে বিশুদেরকে এগিয়ে আমি আর সোবান দৌড় দেই পাইলচাড়া বাজারের শেষ মাথায়। লোকজনের মাঝ দিয়ে, তরকারির বাজার পেরিয়ে বিষাদুর দোকানের পাশে গিয়ে তল্পিতল্পা গোটাতে দেখি একজনকে।

'চাজি, হামরা বুড়া নউগত ছবি দেখপার চাই।' বলে সোবান।

'হাটের পুবপাশে চলো। দেখাই'– ম্যাজিশিয়ান লোকটা বলে। ম্যাজিক দ্যাখানোর সাথে সাথে হাতের বুড়ো আঙ্গুলে অদ্ভুত সব ছবি দেখায় লোকটা। সন্ধ্যায় হাটের পশ্চিমে মজমা করে। সন্ধ্যার পর পুবে চলে যায়। পুবদিকে আমাদের বাড়ি। তাই পশ্চিমেই তাকে নির্জনে পেয়ে ছবি দেখবার জন্য জেরবার করি। পুবে গেলে পাছে পরিচিত কেউ যদি দেখে ফেলে।

'টাকা দেও'– লোকটা বলে। সোবান আর আমি দুই টাকা বাড়িয়ে দেই। প্রথমে সোবানের পালা। সে হাত বাড়িয়ে দিলে লোকটা হাত ধরে ধরে মন্ত্র পড়ে। তারপর দুই ফোঁটা তেল দুই হাতের তালুতে রেখে মুঠো বেঁধে হাতের পাশাপাশি রাখা দুই বুড়ো আঙ্গুলের নখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সোবান। বলে–

'একটা ঘর দেখি, চাজি।'

'আর কী কী দ্যাখো।'

'ঝকমকা পাথরের ঘর। জুম্মার মোতন।'

'তাজমহল?'

'হ তাজমহল।'

লোকটা সোবানের নাম ধরে ডাকে। বলে, 'মুঠা খোলো সোবান।' সোবান মুঠো খুললে তাজমহল হাওয়া হয়ে যায়। এবার কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে দেই আমি। মাগরিবের নামাজের পর বাইরে থাকায় খুব দুশ্চিন্তা হয়। বাপ যদি বকে। লোকটা দুই হাতে দুইটা হাত ধরে। কী গরম তার হাত। মন্ত্র পড়ে ফু দেয় আমার মুখে। দুই ফোঁটা তেল দেয় দুই হাতের তালুতে। মুঠো বন্ধ করে দিয়ে চোখ বন্ধ করতে বলে। দুই মুঠো এক করে বুড়ো আঙ্গুল পাশাপাশি এনে দেয়। চমকে দিয়ে বলে– 'চোখ খোলো।'

চোখ খুলে আঙ্গুলের দিকে তাকাতে ভুলে যাই। লোকটা বলে 'এবার দ্যাখো। সময় হইছে।' তাকাই। প্রথমে কিছুই দেখি না। পরে আবছা কিছুকে দু'আঙ্গুল জুড়ে ছুটে বেড়াতে দেখি।

'কি দ্যাখো?'

'থামে না তো। বুঝবার পাই না।'

খানিক অপেক্ষা করে লোকটা। আঙ্গুলের নখে এক মেয়ের ছবি ফুটে উঠতে দেখি হঠাৎ। হাত কাঁপতে থাকে থর থর।

'কি দ্যাখো।'

'মেয়ে একটা।'

'কেমন দ্যাখো।'

'খুব ভালো। খুবই সোন্দর।'

'চোনো তারে।'

'নাহ। চিনি না।'

'মুঠা খোলো নুরেসলাম'– বলে লোকটা অবাক হই আমি আমল কেমনে জানে এই ভাবে।

'আরেকটু দেখি।'

লোকটা হাসে। বলে না কিছু। এক সময় মুঠো খুলি আমি। আসার সময় বলি 'চাজি, মেয়েটাকে চিনি না যে! দেকি নাই যে কোনো দিন।'

'দ্যাখো নাই দেখবা। আইজ হউক কাইল হউক দেখবা অবশ্যই। মন দিয়ে খোঁজো।'

ফেরার সময় খুব ধীরেসুস্থে হাঁটি। সোবান বলে– 'কী দেকলু?' উত্তর করি না। শুধু হাসি। ঘরে এসে পড়ায় মন বসে না। ঝিম মেরে বসে থাকি। হাত মুঠো করে বুড়ো আঙ্গুল দু'টো এক করি গোপনে। বিশু তাকালেই চমকে উঠে মুঠো খুলে ফেলি।

ওভারকোট

তখন সন্ধ্যা। ধানক্ষেতের প্রান্ত ধোঁয়া ধুলায় একাকার। কাছে পাইলচারা বিলের ধারে জ্বলে উঠছে মাছ পাহারার বাতি। কালিসন্ধ্যা তাতে আবার পাইলচারা বিল, এতো বড় সেয়ানা তো হইনি আমরা। লালবাগ হাট থেকে বাই সাইকেলে বাপের মতো মাল নিয়ে ঝুমুত ঝুমুত আওয়াজ করে বাড়ি ফিরবো। বিলে আলাই মারবো। মাছ মারতে গিয়ে বিষাক্ত সাপের শরীরে কোচ মারবো। সে দিন এখনো আসেনি। তবু যে, এই ভূত প্রেত মশান ডাকাতদের আখড়ার পাশে ক্ষেতের নাড়ার উপরে বসে আছি দুই ভাই? কারণ, মা বলেছে তোরা দুইজনে পাইলচারা থেকে ধানের ভাগ নিয়া আয়। আমরা যখন পাইলচারা এলাম তখন তো বিলে গোধুলির রঙিন আলো। সূর্য ডিমের কুসুমের মতো আভা ছড়াচ্ছে। বড় রাস্তা ওপারে। রাস্তার ওপরে হরেক রকম চলাচল। তাইতে ধুলায় ধুলাকার। তমিজ যাদু হাঁক দিয়ে বলে, দোনো ভাইয়ে মিলি আলচেন বাহে, ধানের ভাগে নিবার তখনে? আমরা বলি, হ যাদু। মনে মনে বলি, হামরা যে চালাক, হামাক ঠকবারে পাবান ন্যান। আমরা আইলের উপর বসি আর তমিজ যাদুর আঁটি ভাগাভাগি নিরখ করি। আঁটি গুনি, খেই হারাই আবার গুনি সব আঁটি ভাগ শেষ হলে তমিজ যাদু বলে, কোনটা নেমেন কন এলা। আমরা দেখি দুই ভাগই সমান। তখন ভাগ দুইটা ঘুরে ঘুরে দেখি। দেখে ফোলাফোলা ভাগটার দিকে আঙ্গুল তুলে বলি এইটা। তখন তমিজ যাদুর লোকেরা একটা গরুর গাড়িতে আমাদের ভাগ ওঠাতে থাকে। এই ফাঁকেই সন্ধ্যা হয়। হিমহিম উত্তুরে বাতাস এসে এসে কাঁপিয়ে দিতে থাকে। আমি বলি, বিশুরে জাঁড় নাগে। বিশু বলে, মোকও। যাদুরা কাছে। তবু ভূত প্রেতের ভয়ও লাগে। তখন আমরা যাদুদের কাছে ভিড়ি। গাড়িতে ধান চাপানো শেষ হলে বাঁশ দড়িতে আচ্ছা করে ধান বেঁধে আমাদেরকে ঘাড়ে তুলে ধানের গাড়ির উপরে তুলে দেয় তমিজ যাদু। বলে, বাঁশটা ভালো করি ধরি থাকমেন। আমরা বাঁশটা ভালো মতো ধরে থাকি। গাড়িতে গরু জুড়ে ধুর ধরে রওনা হয় গরুর গাড়ি। হ্যাক্কর দোক্কর দোলা বাড়ি। এই মনে হয় বিশু পড়ে। এই মনে হয় আমি পড়ি। দোলাবাড়ি শেষ হলে গাড়ি বড় রাস্তায় ওঠে। তখন আমরা শুয়ে পড়ি। আবার যখন নিচু গাছ আসে তখনো শুয়ে পড়ি। ধানের গরম আর গন্ধ তখন শরীরে লেগে যায়। বাড়ি ফিরলে সাথে সাথে মা বলে যা, গোসল করি আয়। গরম

কাপড় পরি পড়া করবার বইস। হিম ঠাণ্ডার মধ্যে আমরা গোসল করতেও না পড়তেও না কিছু করতে ভালোবাসি না। মা তবু পিছু ছাড়ে না। তখন আমরা হাত মুখ ধুয়ে আসি। মা বলে, হয় নাই গাও ধুয়া আয়। আমাদের তখন সম্মানে বাধা লাগে। ক্ষেতের কাজ করে ফিরে আমাদের তো মনে হয় আমরা বাঘ মারছি। মা বলবে, আয় বাবারা আজ সন্ধ্যায় আর হাতমুখ ধোয়ার কাম নাই। খাইতে দেই। খায়াদায়া বুড়াবুড়ির সাথে গপসপ কর। তা না করে মা বলে, হয় নাই, গাও ধুয়া আয়। আমরা বলি ব্যাপারির বেটি, গাও ধুবার পাবান নেই। মা তখন মারে। বলে, শয়তানেরা যা বাড়ি থাকি বাইর হয়া যা। আমরা তখন উঁ উঁ করে কাঁদি। কাঁদতে কাঁদতে উঠানে গড়াগড়ি দেই। মা তখন আরো মারে। আর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে উঠানের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। আমরা ফুঁপিয়ে ফুঁরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাই দাদির কাছে। বুড়া বুড়ি আবার রাত্রে রুটি খায়। দুধ আর ঝোলা গুড় দিয়ে মাখিয়ে গমের রুটি খায়। আমাদের কাঁদতে দেখে দাদা বলে, কী হইছে দাদা আয় মোর কোলাত আয়। আমরা দুই ভাই দাদার দুই কোলে বসে পড়ি। তবুও কান্না থামে না। বলি যে, ব্যাপারীর বেটি খালি ডাঙ্গায়, একনাও আদর করে না। ওই মাওয়ের মুখও দেখবার চাঁও না। দাদী তখন নারাগে মাকে বকতে থাকে। বউ শাউড়িতে যদি ঝগড়া বাঁধে এই ভয়ে আমরা চুপ থাকি। তখন দাদা একটা গল্প ধরে। আমরা কান্না থামিয়ে দাদার গল্প শুনি। দাদীও বকাবাদ্য বন্ধ করে গল্প শোনে আর রুটি ভাজে। রুটির গন্ধে আমাদের ক্ষুধা লাগে। দাদা বলে রুটি খেকো পশ্চিমাদের গল্প, যারা ছাতু খায় পানি খায় আর খায় রুটি। দাদা বলে পশ্চিয়া ভূত আড়াবাড়িত শুত। সেই সব দশাসই পশ্চিমারা শুধু মাইলকে মাইল মাটি কাটে। আর রুটি খায়। রুটি খেকো পশ্চিমাদের গল্প শুনতে শুনতে তৈরি হয়ে আসে দুধ ঝোলাগুড় আর রুটির মাখানো খাবার। বুড়ি আমাদেরকে তুলে খাওয়ায়। বুড়ির হাত ফাটা। খরখরে। তবু খুব ভাল লাগে সেই রুটি। খাওয়া শেষ হলে বুড়ি মুখ মুছিয়ে দেয়। আমরা দুই ভাই দাদাকে জড়িয়ে ধরে বলি, দাদা আরাকটা গল্প কন। দাদা বলে আইজ না কাইল। আমরা বলি আইজে কন দাদা। তখন দাদা বলে, দিল্লী আগ্রা না হায়দ্রাবাদে ছিল দুই ভাই। একজনের নাম ছিল শওকত আলী আরেকজনের নাম...। আমরা বলি দাদা খুব জাঁড়। তারপর দাদাকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে তার ওভারকোটের ভিতর ঢুকে পড়ি। ঢুকে গলা বের করি তার গলার পাশ দিয়ে। দাদা তখন বলে মোক মারবু নাকি। বলে হাত দিয়ে মাথা বের করেক। হাতা থেকে হাত বের করে দাদা। ডান হাতা দিয়ে বিশু বাম হাতা দিয়ে আমি মাথা বের করি। দাদা বলে, একদম নড়াচড়া করিস না। চুপচাপ থাক। ওভারকোটের আর দাদার শরীরের গরমে চুপচাপ গল্প শুনতে থাকি আমরা। আরেকজনের নাম মোহাম্মদ আলী। বলি, দাদা এইটা তো গল্প না, সত্য কথা। এই কথা বলি কারণ আমাদের বাবা শওকত আলী আর চাচা মোহাম্মদ আলী। বলি, একটা গল্প কন দাদা। দাদা বলে ওই দুই ভাইয়ের নামও শওকত আলী আর মোহাম্মদ আলী। তখন ব্রিটিশ আমলা। দুই ভাইয়ের খুব মিল। দুই ভাইয়ের স্বপ্ন

ছিল... । আমাদের চোখে ঘুম লেগে আসে । একসময় ঘুমিয়েই পড়ি আমরা । দাদা যখন দ্যাখে আমরা আর হুঁ হাঁ করি না, তখন বলে, শয়তান দুইটা নিন আলচে । তখন দাদী বলে, বউ বউ ও বউ ছাওয়া দুইটাক নিয়া যাও । খায়া দায়া শুতি পলচে । মা জননী, তখন কোলে করে এনে আমাদেরকে বিছানায় শুইয়ে দেয় ।

সকাল হলে বিশুর ঘুম ভাঙ্গে সবার আগে । সে তখন আমার কান টানে চুল টানে । এই সব ঝামেলার কারণে বিশুকে আমার একদম ভালো লাগে না । কিন্তু কী করি । আমরা এখনো অনেক ছোট । নিজেদের বন্ধু-বান্ধব বলতে কেউ নাই । ফলে ওই বিশুর সঙ্গেই ঘুরি । তার আদব লেহাজ নাই । তবু ওর হাত ধরে ঘুরি । এক সঙ্গে আড়াবাড়িতে হাগতে যাই আর সারাদিন মাছ মারি । পাড়ার ছেলেপেলেরা আমাদেরকে খেলায় নেয় না । বলে, তোরা দুই ভাই একলা খেল । আমরা দুই ভাই তখন রাস্তায় বসে কান্নকাটি করি । কান্নাকাটি শেষ হলে আধভেজা বালুমাটি বের করি রাস্তার বালু সরিয়ে । সেই বালুতে একজন হাত দিয়ে থাকি আর অন্যজন হাতের উপর বালু চাপা দেই । এমনি করে বালুর ঘর তৈরি করি দুইজনে দুইটা । তারপর দু'জন ফল পাতা হাড়ির খোলা দিয়ে ঘর সাজাই । ঘাসপোকা ধরে এনে তাদেরকে নিজেদের ঘরের বাসিন্দা করি । নিজ নিজ বাড়িতে রান্না বান্না করে একটা পোকাকে পাঠাই বিশুকে দাওয়াত করতে । বিশু বলে, জিটিকে বলবা বিশু চাজি বাড়িত নাই । রাত্রে আসবে । বিশু তখন, সে বাড়িতে নাই এইটা দেখানোর জন্য আমতলা জামতলা কাঁঠালতলা ঘোরে । কাঁঠাল গাছের ছাল তুলে রং ছেনে আনে । আমিও রাত্রের জন্য রান্নার আয়োজন করি । বিশু এদিক সেদিক ঘুরে হেঞ্চাইয়ের ফল সংগ্রহ করে আমার বাসায় আসে । বলে, ভাই বাড়িতে আছেন । আমি বলি আইসো, আছি । আমার হাতে হেঞ্চাইয়ের ফল ধরিয়ে দিয়ে বলে, ছেলেপেলেদের জন্য কলা আনলাম । আমি বলি, এই সবের কী দরকার ছিল, বসো বসো । এই করে করে তাকে আমি ফুল পাতা দিয়ে আপ্যায়ন করি । বিশু বলে, আপনি তো আবার পান খান না । পান হবে না বাসায়? আমি বলি দাঁড়াও দেখি একটু পান জোগাড় করে আনি । পান জোগাড় করতে আমি কবরস্থানের পাশের ঝোপের দিকে দৌড়াই । সেইখানে গেলেই আমার গা ছমছম করে । এখানে দাদার বাপের কবর প্রথমে, সে কবরের উপর লতামাধবীর ঝোপ । তারপর বেলাল চাচা ও দাদার মায়ের কবর, এই কবরের পাশে কামিনির ঝোপ । পাশে বেল গাছ । বেল পাতাই আমাদের পান । এইখানে একদিন দাদা বিশু আর আমাকে নিয়ে এসে বলেছিল, মুই মরলে এটেকোনা কব্বর দিবু । তোমরা দোনো ভাইয়ে মোক কবরত নামাইমেন । তাইতে আমার ভয় করে । এইখানে আসলেই দাদার জন্য বুক কেমন করে ।

আজ বেলপাতার পান আনতে গিয়া দেখি কবর স্থানের মোড়ে অনেক লোক । সবাই মিলে ইন্দিরা সংস্কারে ব্যস্ত । অনেক দিন পড়ে ছিল এটা । কেউ গোসল করতে আসতো না । শান বাঁধানো ইন্দিরা পাড়ে ছেলেরা মার্বেল খেলতো । বহুদিন পড়ে থাকা ইন্দিরায় অনেক ময়লা জমেছে । পানিতে দুর্গন্ধ, ভিতরের দিকের দেওয়ালে বট,

পাকুড়ের চারা হয়েছে, আর শ্যাওলা জমেছে । ছেলেরা পাকুড়ের চারা থেকে কুড়িপাতা তুলে বাঁশি বানিয়েছে । বাজাচ্ছে সেগুলো । বড়রা মাঝে মাঝে তাড়াচ্ছে তাদের । বালটি বালটি পানি তুলে ঘাসের উপর ফেলা হচ্ছে । সেই পানির সাথে বেরিয়ে আসছে সাবান কেস, পয়সা, বালটি, বালটি তোলার শিকল, দা, চাকু, বাঁশের কঞ্চি আরো কতকি । একজন বলে, এটে সোনার মোহরও থাকবার পারে । একজন বলে, কায় নাকি সোনার ঘড়া ভাসপ্যার দেখছিল । আরেকজন বলে ইলা কিছু নোয়ায়, মুই নেজে পাঁচ সেরি একটা কালবাউশ মাছ দেখছিনু । আমি ভাবি বাহা বাহা কী হয় দেখি তো । তাই ছেলেপুলেদের দলে ভিড়ে যাই । হাজামজা পানির গন্ধে নাক ধরে বসে থাকি । আর ভাবি সোনার মোহর ভরা একটা ঘড়া যদি পাইতাম । কিন্তু দেখি যে, মোহর তো ওঠে না । প্রতিবারই পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা কি আধুলিও ওঠে । মনে পড়ে আইসক্রিম খাইতে গিয়া এই ইন্দিরায় একটা আধুলি হারিয়েছিলাম । আমার আধুলিটা এখন আমাকে ফেরৎ দেবে কে? আমি ছোট মানুষ, আমি কেমনে বলি এই আধুলিটাই আমার । এই ইন্দিরায় জমা ছিল । মহররমের মেলায় খাবার সময় রাস্তায় হারানো আধুলি তো নয়, এইখানে জমা ছিল এইটা ।

ছোটদাদা হিসাবি লোক । ইন্দিরার জিনিসপত্র দেখেই বলে এই বালটিটা হামার আর এই কাঁটাটাও । তখন লোকজন বলে, ধিরান মাস্টার, সউগগুলা তুলি । আরো মেলা কিছু পাওয়া যাইবে । কিন্তু ছোটদাদা কারো কথা না শুনে বালতি আর কাঁটা কব্জা করে চলে যায় । আমি ভাবি আমি যদি আমার আধুলিটা এইভাবে কব্জা করতে পারতাম । এখন কী যে করি । কিছু করতে পারি না । তাই বেলা হেলে ছায়া পড়া পর্যন্ত হাপুস নয়নে বসে থাকি । ক্ষুধা লাগলে বাড়ি ফিরি । বাড়ি ফিরে দেখি দাদা হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছে । আমি সেই যে পান আনতে গেলাম বিশুকে রেখে । বিশু পানের জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাস্তাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল । অল্পের জন্য ওর গায়ের উপর দিয়ে একটা গরুর গাড়ি যায়নি । এইজন্য দাদা চেঁচামেচি করতে করতে সবাইকে বকতে বকতে বাড়ি মাথায় তুলেছে । বিশু কিন্তু ঘুমাচ্ছে । আমি তো জানি, আমার জন্য এই অবস্থা । তাই চুপচাপ গোসল করে খাওয়া দাওয়া করে আমতলায় গিয়ে বসে থাকি ।

কোনো কোনো সকালে আবার দাদা ভোররাতে মাকে বলে, ছাওয়া দুইটাকে তুলি দেও । ওমাক নিয়া জামাত পড়বার যাই । আমরা ধুড়পুড় করে উঠে দাদার সঙ্গে নামাজ পড়তে চলে যাই । দাদার ওভারকোটটার প্রতি বড় লোভ, তাই এটা সেই ছুতা করে ওভারকোটে ঢুকে পড়ি । ওভারকোটের ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করি, দাদা এইটা কোনটে থাকি কেনচেন । দাদা বলে, নিলামী মার্কেট থাকি । নিলামী মার্কেটে এতো আরামের জিনিশ পাওয়া যায় এইটা তো আমরা ভাবি নাই । ভাবি যে, বুড়া হইলে আমরাও নিলামী মার্কেট থেকে এরকম ওভারকোট কিনে পরবো । সেই কোটের ভেতর নাতি-পুতিদের নিয়ে টাড়ি ঘুরে বেড়াব । লোকে বলবে কিহে বুড়ার বেটা এতোগুলা ছেলেপুলে নিয়ে কোনটে যান, বলবো, যাই আর কোনটে । বুড়া বয়সে আর

কোনো কাম নাই। নাতিপুতিগুলাক ক্ষেতখামার টাড়ি বাড়ি শিখাই।

সেবার বর্ষার শেষে দাদা বলে, কই হে জিটি বিশু কোনটে তোরা। কোদাইল পাসুন নিয়া হাঁট। কাঁটোলের বীচি গাড়ি। আমরা আর কী করি দৌড়ে গিয়ে কোদাল নিয়ে দাদার পিছু নেই। দাদার হাতে কাঁঠালের বীচি। দাদা বলে, হামার ভিটাটা বালুয়া, কাঁটোল হয় না। আমরা দেখি তাইতো, আমাদের বাড়ি ভিটায় কাঁঠালের গাছ বলতে তো একটা। তার আবার কাঁঠালের নাই সাইজ। নাই মিষ্টি। একদিক পাকে তো আরেক দিন থাকে দরকাচা। দাদা বলে, এই বীচিটা খুব ভালো জাতের। কাঁটোল হয় ইয়া বড়। গাছটা বালুয়া মাটির। হামার এটে ভালো হইবে। কোদাইল দিয়া গর্তের মাটি সরা। মাটি সরিয়ে দেখি গর্তে আগেই গোবর সার দেয়া আছে। বৃষ্টির পানিতে গোবর সার জমে গেছে। দাদা গোবরের উপরে দোআঁশ মাটির একটা আস্ত র ফেলে। বলে, মোর পিটিত উঠ একজন, ঘাড়ত উঠ একজন। আমরা বলি কেন দাদা। তাইলে কাঁটোলও পিটাপিটি ধরবে। উট কেনে। আমরা দেখি দাদা বুড়া মানুষ, আমাদের ভার সইতে পারে না। তবুও দাদার পিঠে আর ঘাড়ে উঠি। দাদা বলে, বিছমিল-াহ ক। আমরা বিছমিল-াহ বলি। দোআঁশ মাটির ভেতর চারটা কাঁটালের বীচি পুঁতে দেয় দাদা। আমরা পিঠ থেকে নেমে গর্তটা মাটি দিয়ে ভরাট করি। দাদা বলে, মুই তো আইজ আঁছো কাইল নাই। তোমরা কিন্তু, গাছটাত পানি দেমেন। আর যখন কাঁটোল খাইমেন তকন মোর কতা কইমেন। কাঁটোল খারাপ হইলে মরা মানুষটাকে ফির গাইল দিবান নেন। দাদা মৃত্যুর কথা বললে, আমাদের খারাপ লাগে, আমরা বলি ইলা কথা কন না দাদা। সেই বর্ষা গিয়ে আশ্বিন মাসেই শীত পড়লো। অগ্রহায়ণে মহাশীত। শীত বাড়লে দাদার হাপানি বাড়ে। পানির টান ধরে। বড় ওভারকোটে আর হয় না। আর কোট পরবে কি দাদা বিছানা থেকেই উঠতে পারে না। আমরা দাদার বিছানার শিয়রে বসে থাকি কিন্তু কাশি উঠলে খুব বিরক্ত লাগে। মনে হয় এই কাঁশি দিতে দিতেই দাদা বুঝি মারা যায়। তখন বাইরে আসি। দাদা বলে আয় দাদারা, মোক ছাড়ি যাইস না। তোমাক দেকতে দেকতে মরি যাও। আমরা বলি, না দাদা। কিন্তু দাদা আর পৌষ মাসের শীত সহ্য করতে পারলো না। একদিন সকালে, দাদা খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলো। দাদী ঘরের বাইরে এনে তাকে ওজু করালো। তারপর তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে নামাজে বসিয়ে দিলো। মা তখন ভাত নামিয়ে ডিম ভুনা করতে দিয়েছে। এই খেয়ে বাপ টাউনে যাবে মাল করতে। আমরা চুলার ধারে সপ বিছিয়ে পড়তে বসেছি। অমনি দাদী বললো, বিশুরে তোর বাপক ডাক। তোর দাদা বুঝি যায় যায়। ডিম ভুনা কোন চুলায় গেল। আমরা দেখি দাদা নিয়্যাত বাঁধা অবস্থায় বিছানায় ঢলে পড়েছে। বাপ বলে, যা জিটি, তোর ছোটদাদাক ডাকি নিয়া আয়। আমার বুক ধুক ধুক করে। এক পা আকাশে, একপা পাতালে। আমি দৌড়ে যাই ছোটদাদার বাড়ি। বলি, দাদা হামার বাড়ি হাঁটো, দাদা মরি যাওচে। ছোটদাদা বলে মরবাননেয়, মুই গরুটা বান্দি যাওচো। আমি বলি, গরু পরে বান্দেন দাদা। দাদা মরি যাওচে। বলে আমি কেঁদে ফেলি। ছোট দাদাকে নিয়ে এসে

দেখি, দাদা মারা গেছে। বাড়িতে কান্নার রোল।

দাদা মরার পর বাড়িটা ফাঁকা লাগে। চারা কাঁঠাল গাছটার দিকে তাকালে দাদার কথা মনে হয়। কামরাঙ্গা গাছটার দিকে তাকালে দাদার কথা মনে হয়। বড় খানকার দিকে তাকালে দাদার কথা মনে হয়। কাঁদতে কাঁদতে আমরা দুই ভাই বুঝি অন্ধ হয়ে যাবো। এত কাঁদি বলে লোকে আমাদেরকে কবরস্থানের দিকে যেতে দেয় না। আমরা চুপি চুপি এক সকালে ঘরে যাই। দেখি, দাদার গন্ধ। বিছানায়-বালিশে তামাক, পান সুপারি, ঔষধ, পোশাক-আশাক সবমিলিয়ে দাদার গন্ধ। দাদার কাগজ-পত্রে দাদার গন্ধ। দাদার বিছানাটায় কেউ শোয় না। ঠাণ্ডা বিছানা। সেই বিছানায় আমরা গোপনে শুয়ে থাকি। আমাদের আরো ঠাণ্ডা লাগে। বিশু বলে ওই যে, বলে আলনার দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায়। দেখি লম্বা কালো ওভারকোটটা আলনায় ঝুলে প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। কাউকে আর কিছু বলতে হয় না। দৌড়ে গিয়ে দুইজনে সেই ঝোলানো ওভারকোট ঢুকে পড়ি। ভেতরটা দাদার গন্ধে ভরে আছে। ওভারকোটটাকে আস্ত দাদা মনে হয়। ওখানে ওভারকোট জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আমাদের ওম লাগতে শুরু করে। দাদা দাদা বলে আমরা ডুকরে কেঁদে উঠি।

আমাদের সেই প্রিয় ওভারকোটটাও একদিন বাড়ি থেকে চলে গেল। মৃতের কোনো কিছুই আর বাড়িতে রাখতে নেই। রসুলুল-াহও তার মৃত্যুর আগে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী মৌখিকভাবে অন্যদের দান করে গিয়েছিলেন। একদিন ঠাণ্ডায় কুকড়ানো এক ফকির এলে দাদী বললো যা তো বিশু ওভারকোটটা ফকিরটাক দিয়া আয়। তোর দাদার জন্য দোয়া করার কইস। আমরা ফকিরের হাতে ওভারকোটটা তুলে দেই। ফকির প্রায় আধাঘণ্টা দাদার রুহের মাগফেরাতের জন্য হাত তুলে দোয়া করে। আমরা দাদীকে আর বলতে পারি না, দাদী ওভারকোটটা হামার জন্য আলনাত ঝুলি থোন, এইটা হামার দুই ভাইওক দিয়া দেন। ফকির সাইব ওভারকোটটা নিয়ে চলে যায়।

দ্বিচক্রযান

একেকদিন মনে হয় পক্ষিরাজ ঘোড়া হয়ে যাই। যেদিক ইচ্ছা উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু উড়ি কেমনে– পাখা নাই। নিদেনপক্ষে একটা হেলিকপ্টারও নাই যে এপাড়া-ওপাড়ার কিছু কিছু মেঘের উপর দিয়া ঘুরে আসি। যানবহন বলতে ঘরে আছে দুইটা বাইসাইকেল। একটা বাপের। ওই সাইকেল মোছা আর গিয়ারে-চাকায় তেল দেওয়া ছাড়া বেশি আগানো নিষেধ। বাপ রাগী মানুষ। দরকারের সময় হাতের কাছে সাইকেল না পেলে চিল-ায় আর রাগে ফায়ার হয়ে বাড়ি মাথায় তোলে। তাই বাপের সাইকেলে আমার কাজ নাই। ধরা তো দূরে থাক– ওটার দিকে তাকানোও আমাদের জন্য নিষেধ। তো থাকো বাপু, তুমি তোমার সাইকেল নিয়ে। কিন্তু কোনও সাইকেলই নাই সে হলে কী চলে? তছির দাদা বলে, এই বয়সের ছেলে-পেলেরা নাকি পাক্ষা। তাই এই বয়সে তাদের ওড়ার একটা না একটা যন্ত্র চাই-ই-চাই। কে না চায় একটানে মাইল কি ক্রোশটাক পথ লাফিয়ে কি উড়ে উড়ে পার হতে। সাইকেল অবশ্য আরেকটা আছে। সেটা জিটির। জিটি রক্তচোষা জাতের। সাইকেলটা যে ওর এটা ও সারাক্ষণ মনে রাখে। ঘুমের মধ্যেও জিটি প্যাডেল চালায়। তখন তো ওর পাশে ঘুমানোও দায়। আমি করি কী, যখনই দেখি জিটি প্যাডেল চালানো শুরু করেছে ওমনি একটা ল্যাং মেরে গুম হয়ে থাকি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সে বুঝতে পারে না কী হলো? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার। তো ওই জিটিই সারাদিনমান সাইকেলটার ওপর ফণা তুলে বসে থাকে। কাছে গেলে ফোঁস ফোঁস করে এগিয়ে আসে। আমিও কম যাই নাকি? জিটিকে ফুসলানো আমার কনে আঙ্গুলের কাজ। জিটিকে বলি জিটি হে, দাদীক দেখনু মোয়া বানাইতেছে। তোক উকটায়। জিটির আবার মোয়া খুব পছন্দ, মোয়ার কথা শুনে সে পড়িমড়ি করে দৌড় দেয়। এই সুযোগে আমি সাইকেল বাগিয়ে ভোঁ দৌড়। দৌড়, দৌড়, দৌড়। এক দৌড়ে পাইলচারা বাজার, বাজার ছেড়ে কাটাবাড়ি বুলি সাইকেল হাঁকাই। এই বুদ্ধিটা অবশ্য আমার না। আনছার যাদুর। আনছার যাদু মস্ত মিথ্যাবাদী লোক। মহাসেয়ানা।

একটা আস্ত মানুষকে দিনে-দুপুরে লালবাগের হাটে বিক্রি করে কিনে আবার বিক্রি করতে পারে। তার আরেক ক্ষমতা হলো অনর্গল মিথ্যা বলে যাওয়া। সে হলো মিথ্যাকথার যাদুগর। লোকে বলে যাদু হে, তোমার গল্প শোনতে শোনতে মনে হয় এতুগুলা কথা কী মিথ্যা হবার পারে? এগুলা তুমি শিখলা কই? যাদু একটু মিচকি মেরে হাসে। যাদু যে যে-সে মাল না এইটা বুঝায়। তো একদিন আমি যাদুর কাছে গিয়া আমার সমস্যা বলি। বলি, যাদু হে, এনা বুদ্ধি ধার দেও। আমার ঘটে বুদ্ধি হলে ফেরত নিও নে। যাদু বলে বেশ তো, তোমাক একটা গল্প বলি? গল্প থাকি তুমি তোমার শলা বুঝি নেও। আমি বলি কন। গত বর্ষায় আমাক দেখচো? না দেখো নাই। একবারও জিজ্ঞেস করছো যাদু হে, গত বর্ষাত কই আছনেন? করো নাই। অবশ্য করলেও উত্তর দিতাম না। গত বর্ষায় আমি গোপালপুর আছলাম। গোপালপুর কেমনে গেলাম সেই কথাই তোমারে কই। একদিন ভোররাতে স্বপ্ন দেখলাম, এক বুড়ি মা ধবধবে শাড়ি পরে আমার দিকে আগায়া আসতেছে। কাছায়া আসি কয়, আমারে চিনছো? আমি কই, না চিনি নাই। চিনো নাই? অবশ্য না চিনারই কথা। আমি জমিদার সতিশচন্দ্রের নানি। সতিশচন্দ্র আচলো গোপালপুরের জমিদার। ফিফটি ফোরের রায়টের পর কইলকাতা গেইছে। আমি কই, তা বুড়ি মা হঠাৎ কী মনে করে আমাক স্মরণ কননেন? বুড়ি বলে, নাতি তোমাক আমি অনেক দিন ধরি খেয়ালে রাখছি। তুমি কেশবপুরের ভাঙামন্দিরের পাশ দিয়া যাওয়া-আসা করো না? ওই ভাঙা মন্দিরেই থাকি আমি। তোমার চলন-বলন আমার পছন্দ হইছে। আমি তোমাক কিছু ধন-সম্পত্তি দিবার চাই। কেন বুড়ি মা? তোমার সুখ দেখপার চাই। বেশ, কই আছে তোমার ধন-সম্পত্তি? গোপালপুরের জমিদার বাড়ির নিচে ছোট্ট একটা কুঠুরি আছে। সেই কুঠুরিতে আছে ধনসম্পত্তি। সেখানে কেমনে যাবো? সে চিন্তা আমার, তুমি খালি ধন-সম্পত্তি নিয়া ফিরি আসবা। কিছুক্ষণ পর ঘুম ভাঙতে দেখি, আমি একটা কুঠুরির মধ্যে ছালার বস্তার মধ্যে শুতি আছি। দুই-তিনটা প্রদীপ জ্বলতেছে। দুইদিকে সার সার পিতলের ঘড়া। ওই ঘড়ার মধ্যে সোনার মোহর। খেয়াল করি দেখি ঘড়ার মুখে বড় বড় গোখরা ফণা তুলি বসি আছে। একটু নড়তে গেলেই ফোঁস করি ওঠে। কী করি কী করি? কোনও উপায় পাই না। ভালোমতো চাইরদিক তাকায়া দেখি একটা ঘড়ায় শুধু সাপ নাই। সাহস করি গেইলাম সেই ঘড়ার কাছে। ডালা তুলতেই আমি অবাক। দেখি, একঘড়া দুধ। ঘরের মধ্যে টাটকা দুধের গন্ধ ছড়ায়া পড়লো। ওই গন্ধে গন্ধে সাপগুলা ঘড়ার দিকে আগায়া আসলো। এইটুকু বলে যাদু থামে, আর বলে না। তারপর কী হইলো যাদু? সে জেনে তোমার কাম নাই। সে অনেক গল্প। তুমি তোমার প্রশ্নে উত্তর পাইছো তো হইছে। সেই কামরায় আমি ৩৩ দিন আছলাম। মেলা ঘটনা ঘটছিলো। আর হাজার হাজার সোনার মোহর যে আনতে পারি নাই তাতে আমাক দেখিয়াই বুঝতেছো। যাও এলা। তো ওই যাদুর বুদ্ধি নিয়া আমি জিটিক ধোঁকা দেই। ছল করি, সাইকেল নিয়া এদিক সেদিক ঘুরি। শুকানদিহি, পাইলচারা, কেশবপুর, গোপালপুর কই না যাই? এখন পুটিমারি তো

তখন কাঁটাবাড়ি। চাইলে তো আকাশেও ওড়া যায়। উড়ে উড়ে গিয়ে কেয়াদের খুলিত গিয়া পড়া যায়। যোগ দেওয়া যায় ওদের গোল-ছুট খেলায়। চাইলে তো ওড়া যায় নাকি? গ্রাম পেরিয়ে, পাইলচারা হাট পেরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে আখক্ষেত, আলুক্ষেত আর হাজারো ক্ষেত-খামার রেখে চাইলে উড়ে বেড়ানো যায় আকাশে আকাশে। যায় না কি? মাটিতে যেমন চিকন চিকন পথ, মোটা মোটা অজগর সাপের মতো পিচ রাস্তা তেমনি তো আকাশেও নীল কেটে কেটে তৈরি করা চিকন চিকন, মোটা মোটা পথ-ঘাট। কোনোটা হয়তো কমলা রঙের পিচে ছাওয়া কোনোটা হয়তো বেগনি রঙের পিচে ছাওয়া। আছে, তুলা তুলা মেঘের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা– সেগুলোতে তো সাইকেল চালানোই দায়। কোথাও আবার জলজ মেঘ। চাইকেল ওর মধ্যদিয়ে চালালে কত রঙের কাদাই না জমা হতে পারে। আকাশে অনেক সুবিধা আছে– একবার উঠে পড়লে আর প্যাডেল চালাতেই হয় না। নিজের বেগে আপন মনে সাইকেল চলে পাল তোলা নৌকার মতো- তুমি শুধু রাজপুত্রের মতো দুইহাত দু'পাশে ছড়িয়ে বসে থাকো, ব্যস। আকাশে সাইকেল চালানোর মতো সহজ কাজ আর নাই। একটু উঁচু উঁচু খাড়ি খাড়ি জায়গা থেকে একটা লাফ দাও। তারপর কিছুক্ষণ বাতাসের হাল বুঝে নাও, গতি বুঝে এবার পাখা উড়িয়ে বসে থাকো। পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো দু'একবার পাখা নাড়ো- এইবার উড়ে চলো দিক-দিগন্তে। কোথায় কেয়াদের বাড়ি, কোথায় নানাবাড়ি, কোথায় কাশবাগান। চলে আমার সাইকেল হাওয়ার বেগে উইড়া উইড়া। কালো-সাদা মেঘগুলো ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে সরিয়ে লাল নীল হলুদ বেগনি শতশত তুলা তুলা মেঘের ভেতর দিয়া। শ্যামপুরের ওপরের মেঘের বেতর দিয়া বসন্তপুরের মেঘের দিকে। দূরে পেঁজা পেঁজা ধূসর মেঘ– কৈবর্ত পাড়ার দিকে। তারপর কয়েকটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো লাল মেঘের পর বাওচণ্ডী গ্রামের মেঘ। শুধু তো মেঘের নিচেই নয়, মেঘের উপরেও কত বাড়ি, সাধারণ লোকের, রাজ-রাজড়ার বাড়ি সবই আছে। রঙিন সব বাড়ি। সারসার বাড়ি পেরোলে সোনা দিয়ে মোড়ানো এক রাজপ্রাসাদ। ওখানে মুড়ি-মোয়ার উৎসব। লক্ষ লক্ষ খৈ ছড়ানো। ওই দিকে প্যাডেল চালাতেই নিচ থেকে কে একজন ডাক পাড়ে– ওই ছোড়া, ওই ছোড়া। কিসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি। মখমলের মতো পাতলা একটা মেঘ সরিয়ে নিচে দেখি, শ্রী নগেন্দ্রনাথ সরকার– আমাদের ডাক্তার মশাই। তার আবার এ বেলা আমাকে স্মরণ হলো কেন? তিনি তো ডাক দিয়েই খালাস, তো অতো উপর থেকে নামা কি সহজ? নগেন ডাক্তার বড় বেরসিক লোক। উনি তো সাইকেল চালান কচ্ছপের বেগে। সাইকেল এক প্যাডেল আগায় তো দুই প্যাডেল পিছায়। আধমরা বুড়ার পক্ষে এর বেশি আর কী সম্ভব? কিন্তু আমার পিছনে লাগে কেন বুড়া? এখন নামো। পাখা দু'টা গুছিয়ে রাখো। হ্যান্ডেলে হাত রেখে জোরে একটা ব্রেক কষো। টাল খেতে খেতে হাওয়ায় হাওয়ায় এঁকেবেঁকে নামতে নামতে গিয়ে পড়ো নগেন সরকারে চাঁদি ঘেঁষে একবারে মাঠের মধ্যে। হাড়জিরজিরে বুড়ো নগেন সরকার সাতসকালে বের হয় এলোপ্যাথি ওষুধের পসরা সাইকেলের পেছনে সাজিয়ে। ধীরে ধীরে সাইকেল

চালায়। কচ্ছপের গতিতে চলতে চলতে বুড়ো প্রায় একশ' পনেরো বছর পার করে ফেললো। গ্রাম-গ্রামান্তর হয়ে সাইকেল চালিয়ে হয়তো কোনও পুরানা রোগীর বাড়ি যায়। অথবা এমনি এমনি সাইকেল চালিয়ে ঘোরে, কেউ যদি তাকে রাস্তা থেকে ডাক পাড়ে এই আশায়। এখন অবশ্য রোগের মৌসুম না– তাই হয়তো সরকার মশাইয়ের কাজ থাকে না। তাই আমাকে একেবারে আকাশ থেকে নামিয়ে আনে হয়তো শ্রেফ গল্প করার জন্য। আমি নগেন সরকারের কাছে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাই। সরকার মশাই বলে, ওই ছোড়া তর নাম কী? আমি বিটলা ছেলে, বলতে চাই, নাম দিয়ে তর কাম কী। কিন্তু বলি না। এতো বয়স ওলা সরকার মশাইয়ের জন্য মায়া হয়। তাছাড়া অসুখ-বিসুখের কথা তো বলা যায় না। বুড়া বহুত সেয়ানা মাল জ্বর-সর্দি হলেই শরীরে সুই ফোটাবার তালে থাকে। তাই একটু ভয়ে থাকি। বলি, বিশু। বাপের নাম? শওকত আলী। জব্বার মিয়ার নাতি শওকত? হয়। জব্বার মিয়া আমার বন্ধু ছিল বুঝলি? তর বাপদেরও কত ছোট দেখলাম। তা এতো জোরে সাইকেল হাঁকিয়ে কই যাস? আমি তো যাই বাওচণ্ডী কিন্তু মিথ্যা করে বলি, গোপালপুর। বেশ, গোপালপুর যাস ভালো কথা, কিন্তু এতো জোরে সাইকেল চালাস কেন? আমি বুঝতে পারি না এটা অপরাধ কিনা, তাই চুপ করে থাকি। আমাকে দেখ, দূরে বারোদোনের বিশাল বটগাছের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে নগেন সরকার বলে, ওই বটগাছের সমান বয়স আমার। বল দেখি কিভাবে হলো? ধীরে ধীরে পথ চলেছি বলেই তো? শোন এই বয়স থেকেই নিয়ম মেনে চলবি। তিনটা কাজ করলে শতবর্ষী হতে পারবি। এক. জীব হত্যা করবি না। দুই. রাত জাগবি না। তিন. আস্তে সাইকেল চালাবি। আমি বলি, জী, আচ্ছা। জী আচ্ছা বলায় ডাক্তার মশাই খুশি হয়। কোন ক্লাসে পড়িস রে তুই? ফাইব। বেশ বলতো দেখি, টাইগার মানে কী? বাঘ। বলিস কী, ক্যাট মানে তো বাঘ রে, টাইগার মানে হলো– ব্যাঘ্র। আমি আর বলতেই পারি না যে বাঘ আর ব্যাঘ্রের মধ্যে তফাত নাই বলেই তো জানি। তার আগেই নগেন সরকার বলে, সাইকেলে তো উড়ে উড়ে বেড়াস বল দেখি, বাই-সাইকেল মানে কী? বাইসাইকেল মানে তো বাইকেল। ডাক্তার মশাই আমাকে হারিয়ে দিয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলে– দেখলি তো বলতে পারলি না। তোদের সামাদ মাস্টারকে জিজ্ঞেস করিস। যদি বলতে না পারে তো আমাকে জিজ্ঞেস করিস। একথা বলতে বলতেই সরকার মশাই সাইকেলে উঠে চালাতে শুরু করে। এতো পুরানা লোক বলে আমি আর পিছন থেকে ডাকি না তাকে। কিন্তু বাই-সাইকেল মানে কী এটা জানার জন্য উশখুশ হয়ে থাকি।

নগেন সরকার আমাকে মুশকিলে ফেলে চলে যায়। ওড়া থেকে তো নামালোই আবার জিজ্ঞেস করে বাই-সাইকেল মানে কী? এখন আবার মেঘের ওপর ওঠা কি সহজ কথা? আর ওভাবে মেঘের ওপর না উঠতে পারলে তো সন্ধ্যার আগে বাওচণ্ডী পৌঁছানোও যাবে না। আর সন্ধ্যার আগে পৌঁছাতে না পারলে কেয়াদের গোল-ছুটে পৌঁছানো যাবে না। হয়তো এখন গিয়ে দেখবো, সারা গায়ে ধুলো মেখে কেয়ারা বাড়ির পথ ধরেছে। এখন সামনে পড়লে বলবে, বেশ তো পাখা গজাইছে তর।

কেয়াদের ঝামটা মারা মুখ দেখলেই আমার ব্যাথা লাগে। সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার ধারে বসে পড়ি। চারদিকে সন্ধ্যা নামে। ওপরের আকাশটা হঠাৎ হাওয়া হয়ে যায়। কেশবপুরের ভাঙ্গা মন্দিরে ঝুপ করে একখণ্ড সন্ধ্যা নামে। জোড় পাকুড়ের ধার ঘেঁষে একখণ্ড ছায়া নেমে পড়লে এতো ভূত, প্রেত আর মশানের ভয় জাগে যে তাতে মনে হয়, জিটি'র অভিশাপেই বোধহয় এমন হয়। তাই আমি কান্না করি। কান্না করলে দেখি সাইকেলটা মন খারাপ করে। সেও আমার সাথে কান্না করে। আমি ভাবি, যে আমার ওপর হঠাৎ মশান ভর করে বলে এরকম লাগে। কিন্তু দেখি যে তা না। বরং খুব আন্তরিকভাবে সে আমার জন্য মন খারাপ করে বসে থাকে। আমি তাকে কিছুতেই শান্ত করেতে পারি না। সে ঘাড় কাত করে নগেন ডাক্তারের ওপর ক্ষেপে থাকে। আমি বলি, তুই থাম, এতো বয়স্ক লোক উনি, তার উপর রাগ করা আমাদের উচিত না। হাজার হলেও তিনি আমাদের পরদাদার বন্ধু। সাইকেল যখন আমার সাথে এইসব বিষয় নিয়া কথা বলে তখন আমার সন্দেহ হয়। আমি বলি, তোর মধ্যে মশান ভর করছে তাই তুই মনে হয় কথা বলতে পারিস। সাইকেল বলে, তুমি জিটির সাথে কথা বলো। বুঝবা মশান আমাকে ধরছে না তোমাক ধরছে। আমি দেখি তাইতো, এইবার একটা মোক্ষম উত্তর পাওয়া গেল, জিটি তাহলে এই কারণে আমার কাছে তার সাইকেল ছাড়ে না। সাইকেল আমার সাথে কথা বললেও যে জিটির সাথেই তার বেশি দহরম-মহরম এইটা সে কথায় বুঝিয়ে দেয়। যাই হোক, বাপ-মা হারা সাইকেলটার জন্য আমার খারাপ লাগে। গত কয়েক বছর তো সে আমাদের দুই ভাইয়ের সাথে আরেক ভাই হয়ে আছে। হোক না জিটির সাথে তার বেশি খাতির তবু আমার দুঃখে যে সে কাঁদে– এই কান্না দেখেই আমি খুশি। হাজির বেটা যেদিন তাকে হাতিবান্ধা থেকে পাচার করে আনলো, সেদিন কী সুন্দর না লেগেছিল তাকে। আমরা তো তারও যে বাবা-মা থাকতে পারে তা ঘূণাক্ষরেও ভাবি নাই। সে কিন্তু সেসব কথা মনে না রেখে কেমন আপন হয়ে গেছে আমাদের সাথে। আমি তাকে বাল ভাইটি, বাড়িত যায়া কাকো কইস না। ইলা কথা কওয়া যায় না। সাইকেল আমার কথায় সায় দেয়, কিছু না বলে চুপচাপ মাথা নাড়ে। আমি বুঝি সে আমার সাথে একমত। আস্থা পাই তার ওপর– সে অন্তত জিটির মতো সুযোগ বুঝে আমার ওপর একহাত নেবে না। আমি আর সাইকেল পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরি। সে আমাকে বলে কী ব্যাপার, ওঠো না যে? আমি কিছু বলি না। একটু অবাক লাগে, আজকের আগে কেন আমার মনে হলো না না যে, সাইকেলেরও প্রাণ থাকতে পারে? এটা ভেবে ভেবে লাগাতার অবাক হতে থাকি আমি। ভাবি, জিটির সাথে এই বিষয়ে আলাপ করা ঠিক হবে কিনা। হাজার হলেও সাইকেলটা জিটির, আমার থেকে তার সাথেই জিটির সদ্ভাব বেশি থাকার সম্ভাবনা। আমি অবশ্য এতো কথা মনে হলেও সাইকেলকে জিটি বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি না। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার কথা তো আর সাইকেলকে বলতে পারি না। বাড়ি ফিরে মার সামনে পড়তে চাই না। তাই আড়ালে আড়ালে ঘরের ভেতর সাইকেল তুলে হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসি। এসময়

অবশ্য মা নামাজ-কালাম নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকে। তাই এদিকে তাকাবার ফুসরত পায় না। কিন্তু নামাজ-কালাম শেষেও যদি দেখে আমরা বা আমাদের দুই ভাইয়ের কেউ ফিরি নি তবে চিল-য়া পাড়া মাথায় তুলবে। আর এই সময় হাতের কাছে আমাদের পেলে কাঁচা সিকটি পিটিত ভাঙবে। পড়তে বসি বিশুর সামনা-সামনি। হারিকেন জ্বলে আমার আর বিশুর মাঝামাঝি। আজ দিনমান কী কী হলো সব কথা জিটিকে বলা যায় না। সে আমাকে হিংসা করে। পায়ে পাড়া দিয়ে যুদ্ধ বাঁধায়। হারিকেনের আলো আমার দিকে বেশি এলে তালবাহানা করে নিজের দিকে আলো বেশি বাড়াতে চায়। তবু ভাবি, জিটির সাথে খোলামেলা আলোচনা করা দরকার। সাইকেলে হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো, নগেন্দ্রনাথ সরকারের দেখা পাওয়া, কেয়াদের বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা, কান্না-কাটি সব গোপন করে আমি জিটির সাথে আলাপ করার পায়তারা করি। বলি, দাদা, এই দুনিয়ায় কোন কোন জিনিসের প্রাণ আছে? জিটি বলে, এই কথা কেন হঠাৎ পুছিস? কও না কেন, এই দুনিয়ায় কোন কোন জিনিসের প্রাণ আছে আর কোন কোন জিনিসের প্রাণ নাই। জিটি একটু ভাবুক লোক, বলে, দুনিয়ার সব জিনিসের প্রাণ থাকার সম্ভাবনা আছে আবার সব জিনিসের প্রাণ নাই হবারও সম্ভাবনা আছে। এই যেমন ধর মানুষ, মানুষের যেমন প্রাণ আছে তেমনি মারা গেলে মানুষের আর প্রাণ থাকে না। তাইলে তো সাইকেলেরও প্রাণ থাকতে পারে। জিটি আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়, বিস্ময়ে তাকায়, কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। আমি বলি, কও না কেন? সে বলে, তুই কেমতে টের পাইলি? আমি চোখ নাচাই। তখন জিটি আমাকে প্রাণ বিষয়ে নতুন কিছু কথা বলে। সে হলো ভালো ছাত্র। জানা-শোনা ভাল। এলাকায় তার সুনাম। লোকে তাদের ছেলে-মেয়েদের জিটির নামে মারে আর বলে, জিটি যদি তো পড়া-লেখা করতে পারে তো তুই পারবি না কেন? জিটি বলে, প্রাণ সব জিনিসেই আছে, কিন্তুক সব জিনিসের প্রাণ এখনও আবিষ্কার হয় নাই। এই যেন ধর– গাছ, গাছের যে জীবন আছে এইটা কিন্তু কেউ জানতো না। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের আগে কেউ বুঝতেই পারে নি। এখন কিন্তু সবাই জানে, গাছেরও জীবন আছে। আমি বলি এখন যদি আমরা বলি, সাইকেলের জীবন আছে কেউ মানবে? খালি বললে হবে না। এইটা প্রমাণ করতে হবে। কেমনে? কিছু একটা আবিষ্কার করতে হবে। এসময় মা আন্দন-বাড়ি করতে করতে আমাদের গল্প করতে দেখে। দেখেই চিল-য়, ওই শয়তানরা, পড়া থুয়া খালি কথা কইস! আমরা ভয়ে শব্দ করে করে কিছুক্ষণ পড়ি। তারপর আবার ফিসফাস করে বলি, আমাদের সাইকেলটার জীবন আছে। জিটি বলে, হ। আমি বলি, তুই কেমনে বুঝলি? জিটি রহস্য করে বলে, এমনেই। আমি বলি, কও কেন। জিটি বলে না। শুধু আমার দিকে রহস্য করে তাকায়া থাকে। আমি বলি কও কেন। সে কয় না। খালি বলে, কইম এলা, পরে কইম। বলে জিটি আবার শব্দ করে সমানে পড়তে থাকে। এই কাজ করলে আমি ফান্দে পড়ে যাই। আমিও নিরুপায় হয়ে পড়তে থাকি। তারপর সে সত্য বলে না মিথ্যা বলে বুঝতে পারি না। বলে, সাইকেলটা যে কথা বলে এটা সে প্রথম

থেকে সে জানে এবং এ ঘটনার সূত্রপাত ঘটে সাইকেলটা কেনার একদম প্রথম দিকে। তখন একদিন সাইকেলটার সাথে তার ঝগড়া হয়। সেবার জিটি পুঁটিমারির পাথার দিয়া স্কুল থেকে ফিরছিলো। ধুলাজমা রাস্তায় সাইকেল চলছে না দেখে বিরক্ত হয়ে জিটি সাইকেলে একটা লাথি মারে, এ ঘটনায় সাইকেলের মন খারাপ হয় এবং সে আর না এগিয়ে একদম গোঁ মেরে থাকে। জিটি ভাবে গিয়ার জাম খাইচে কি চেনে কিছু আটকাইছে। কিন্তু দেখে যে সে সব কিছু না। সাইকেলটাই গোঁ মেরে বসে আছে। তখন জিটি তার সাথে আপোস করতে যায়। জিটি কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারে না যে, সে ইচ্ছা করে তাকে লাথি মারে নি। তারপরও সাইকেল গুম মেরে থাকে। এদিকে সন্ধ্যা ঘনায়ে আসলে আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে জিটি হাতজোড় করে তার কাছে ক্ষমা চায়। এ ঘটনার পর থেকে তার সাথে সাইকেলের একটা বন্ধুত্ব হয়। জিটি এ কারণেই কাউকে সাইকেল চালাতে দেয় না। আমাকে বলে, তুই একটা ভোদাই। আমি কেন এতোদিন পর বুঝতে পারলাম যে সাইকেলের প্রাণ আছে এজন্য সে আমাকে ভোদাই বলে। এসময় মা আমাদের খেতে ডাকে। খানা-দানা করতে করতে আমরা চুপচাপ থাকি। মা একটু অবাক হয়। কয় কী ব্যাপার গুম মারি থাকিস কেন? কী হইচে? আমরা কিছু বলি না। মা একটু অবাক হয় কিন্তু কেন জানি কোনো কথা কয় না। আমরা খাইদাই করে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে জিটি আমাকে অনেক গল্প করে তার আর সাইকেলের সম্পর্ক নিয়ে। বলতে বলতে জিটি ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুমিয়ে পড়লেও আমি ভাবানা করি, উখসুখ করি। রাতে উঠে একবার সাইকেলটাকে দেখি। সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে সেও ঘুমিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবি, বড় হলে আমরা প্রমাণ করবো, সাইকেলেরও প্রাণ আছে।

পরদিন স্কুলে গিয়ে আমি সামাদ স্যারকে পেয়ে জিজ্ঞাস করি, স্যার, বাই-সাইকেল মানে কী? স্যার আমার দিকে পুলিশের মতো চোখ করে তাকায়। বলে, কী ভাবিস তোরা, সাইকেলের বাংলা আমি জানি না? স্যারের হুংকারে স্কুলঘর কেঁপে ওঠে। আমার কান ধরে ক্লাসঘরে আসেন তিনি। বলেন সবগুলা নীলডাউন হয়া থাক। আমরা সবাই নীলডাউন হলে বলে, শব্দ করি করি বল, বাই-সাইকেল মানে দ্বিচক্রযান। আমরা শব্দ করে বলি, বাই-সাইকেল মানে দ্বি-চ-ক্র-যা-ন। এভাবে আমাদের পা-হাত ব্যাথা করে। স্যারের ক্লাসের সময় পার হলে আমরা তার হাত থেকে মুক্তি পাই।

বিকাল বেলা হাইস্কুল থেকে জিটি ফেরে। ফিরে দেখে আমি খেলাধুলা করি না। স্কুলের বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকি। এই দেখে সে চিন্তায় পড়ে। বারান্দায় সাইকেল ঠেকিয়ে আমার কাছে আসে। সাইকেলটাকে দেখে আমি খুশি হই। হাত-পায়ের ব্যাথা শেষ হয়ে যায়। জিটিকে আমি বলি দাদা, সাইকেলের একটা নাম পাইছি। আইজ থেকে এরে এই নামে ডাকতে হবে। জিটি বলে, কী নাম? আমি কই, দ্বিচক্রযান।